: পঞ্চম অধ্যায় :

উপসংহার

জীবনানন্দ তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাসে যে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন তা আসলে বরিশালেরই প্রকৃতি। পাঁচ-ছয় বিঘা জমি জুড়ে ছিল জীবনানন্দের বাস্তু ভিটা । আর ছেলেবেলায় জীবনানন্দের নখদর্পনে ছিল -- জমির ঝোপের মধ্যে কোন আনারসের গায়ে হলুদ রঙের আভাস এসেছে, কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল কত বড় হচ্ছে, কোন গাছে কত আম হয়েছে, এসব । তাঁর বাড়ীর সামনে সবুজে ঢাকা প্রাঙ্গণ ছিল । প্রাঙ্গণে ছিল কৃষ্ণচূড়া গাছ । জমিতে অনেক কাশ ফুল ফুটত । একটি বাতাবি লেবুর গাছ ছিল । তাঁর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে ছিল বেতবন । গ্রামের কাঁচা রাস্তার দুধারে ছিল ক্ষেত । কবি দেখেছেন সে ক্ষেতের রূপ । কখনও ধানে ভরা, আবার ধান কাটার পর পড়ে থাকতো নেড়া মাঠ। বরিশালের লাখুটিয়ার খালপাড় ধরে কিছুটা এগোলে শ্মশান, তারপর ছিল লাসকাটা ঘর। বরিশালের সব পথ-ঘাট-মাঠ নদীতীর জীবনানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলির প্রকৃতিতে এসব ছবি লক্ষ্য করার মতো ফুঠে উঠেছে । কোন এক হেমন্তে কবি অনুভব করেছেন ---

"রয়েছি সবুজ মাঠে - ঘাসে ---
আকাশ ছড়ায়ে, আছে - নীল হয়ে আকাশে আকাশে;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে !"[১]--

আরো একটি অনুভূতি ---- "প্রথম ফসল গেছে ঘরে, -- / হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে / শুধু হেমন্তের শিশিরের জল;"[২] ---কবির অনুভবে পাড়াগাঁর গায় আজও লেগে আছে রূপশালি ধানের সৌন্দর্য্য ও রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ । "আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই -- নুয়ে আছে নদীর এপারে / বিয়োবার দেরি নাই -- রূপ ঝরে পড়ে তার, — / শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে !" আরো বিবরণ রণেশ দাশগুপ্তের 'বরিশালের গোলপাতায় ছাওয়া বেড়ার ঘরের জানালার পাশে ছোটো টেবিলে হাত রেখে তাঁর অনেক কবিতাই রচিত । এমনই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে একটি কবিতায় 'গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায় / উড়ে যায় -- মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে ।"[৩]

জীবনানন্দের নানা গল্পে এই আটচালা খড়ের ঘরের কথা এসেছে । কবির ১৯৩০ থেকেই লেখাগুলিতে এসব ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে । "পূব দিকের আটচালার সেই ছোট্ট কোনটুকুর ভিতর খাটের উপর মাদুর ফেলে শুরু থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ...."[৪]

আরও কবি লিখেছেন --

"এই সমস্ত ঘরদোর যদি প্রাণীহীন হয়ে পড়ে থাকে তা হলেও দেশের
বাড়ির এই মাঠ-প্রান্তরের আস্বাদ, জোনাকি জ্বলা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচার
ডাকে ভরা রহস্যময় রাত, পথ প্রান্ত - মানব আত্মাকে অনেক দিন পর্যন্ত
নিবিষ্ট করে রাখতে পারে ।"[৫]

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত - অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৫৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৯
৪. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবনানন্দ দাশ কবি ও কবিতা / ভারত বুক এজেন্সি ঃ কলকাতা ৬ / প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০১ / পৃষ্ঠা ২৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩

১৯৪৮ এ লেখা একটি বিবরণে তিনি বলেছেন --

"বাড়িতে দুটো পুকুর আছে। মাছ আছে দুটে পুকুরের, বর্ষাকালে সেগুলো এখন প্রায় মজে এসেছে। কবিতায় পাই - "অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর / পাশে দীঘি মজে আছে -- রূপালি মাছের কণ্ঠে কামনার স্বর ....."[১]

বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলন সিটি কলেজের ছাত্রদের মনে এক উত্তেজনা তৈরী করে। সরস্বতী পূজার আগে ৩ রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ -এ সাইমন কমিশনের প্রতিবাদের হরতাল, বয়কট ইত্যাদি নানা ঘটনায় সিটি কলেজের হিন্দু ছেলেরা সদল বলে কলেজ ত্যাগ করলে, তাতে কলেজে যে অর্থের অভাব উপস্থিত হয় তাতে অনেকের সঙ্গে জীবনানন্দেরও কাজ যায়। ১৯১৭-১৯২৮ এই বারো বছর জীবনানন্দ নিজেকে এড়িয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে থাকেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাগুলো জীবনানন্দের শহর ছাড়ার সময় থেকে রচিত। যখন জীবনানন্দের কলিকাতা বাসের আরম্ভ তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ হতে চলেছে এবং আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে বাণিজ্য ও প্রভুত্বের সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়েছে। তাঁর 'জীবনপ্রণালী' উপন্যাসে, 'নিরঙ্কুশ' কবিতায় ও 'সাতটি তারার তিমির'এ ঘটনাগুলির ছায়াপাত ঘটেছে।

জীবনানন্দের কিছু কবিতাতে শহরের নিদারুণ পরিস্থিতির কথা ছড়িয়ে আছে। নিষ্করুণ বিশাল শহরের রাজপথে ছিন্নবাস, নগ্নশির, ভিক্ষাজীবি মানুষেরা হেঁটে চলেছে। পাণ করছে হাইড্রেন্টের জল -- 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতায় এই বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে। 'বনলতা সেন' কাব্যের কিছু কবিতায়ও এই ভাব রয়েছে। কলকাতার পথে পথে কবি দেখেছেন -- ডাস্টবিনের পাশে ঘুরে বেড়ানো ইঁদুর, বিড়াল, নেড়ি কুকুর, ক্ষুধিত মানুষের অস্পষ্ট জগৎ। কবি দেখেছেন -- কুষ্ঠ রোগী হাইড্রেন্ট খুলে দিয়ে গা ধুতে বসেছে। কলেজস্ট্রীটে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারের ভিতর দেখেছেন সারি সারি রূপহীনা মানবীকে। 'মহাপৃথিবী' কাব্যেও শহরের এমন টুকরো টুকরো ছবি ফুটে উঠেছে। রূপহীনা নারী সম্পর্কে কবিতায় লিখেছেন -- 'পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ / পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই --- আর তার প্রেমিকের ম্লান / নিঃসঙ্গ মুখের রূপ; / বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ, ...'[২] -- রূপসী বাংলার যে নারীরা অতীতে ছিল রূপবতী, তারা আজ আর নেই। অঘ্রাণের ম্লান উষ্ণতায় মলিন হয়েছে সেই নারীদের রূপ।

কিছু কিছু জায়গায় জীবনানন্দের চোখে শহর, গ্রাম কল্পান্বিত হয়ে উঠেছে। 'বনলতা সেনে'র পথ হাঁটা দৃশ্যে যেমন শহরের চিত্র, ঠিক এরকম 'বিভা' উপন্যাসে গ্রামের চিত্রটিও ফুটে উঠেছে। ট্রাম, বাস, শহরের বিন্দু বিন্দু গ্যাসের আলোগুলিকে জীবনানন্দ জোনাকির জ্বলে ওঠা আলো বলে মনে করেছেন। জীবনানন্দের অনেক গল্পের নায়িকাই বিদূষী ধনী শহরিণী। 'বিভা' উপন্যাসের লেখক আড়াল থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। দেখেছেন নায়কেরা প্রেমিকেরা বিভাকে নিয়ে মনে মনে স্বপ্ন দেখছে। জানা যায় 'বিভা' উপন্যাসে বৌবাজারের বস্তির ঘরে শহরিণী বিভারাণী বোসের সঙ্গে দুই অকৃতার্থ কবি ও এক চিত্রশিল্পীর ঘর বাঁধার স্বপ্ন তৈরী হয়েছে। বিভার সঙ্গে এই ঘর বাঁধার স্বপ্নের কল্পনাকে ঘিরে ১৯৩৩ - এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি লিখলেন 'বিভা' উপন্যাস। উপন্যাসে বিভার কাহিনীকে তিনি শীত রাতের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। বিভা শীত রাত জেগে 'আনা-কারেনিনা' বই পড়ে। বই পড়তে পড়তে গরম কফি খায়। 'বনলতা' সেন কাব্যের 'আমি যদি হতাম' কবিতায় এই বিভা রূপী কোন এক নারীর সঙ্গ কবি অনুভব করেছেন।

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবনানন্দ দাশ কবি ও কবিতা / ভারত বুক এজেন্সি ঃ কলকাতা ৬ / প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০১ / পৃষ্ঠা ১৩৪

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ/অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫/পৃষ্ঠা ১৭৯

'আমি যদি হতাম বন হংস
বনহংসী হতে যদি তুমি,

....

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে

....

তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার
রক্তের স্পন্দন ।"[১]

জীবনানন্দের গল্প, উপন্যাসের অনেক কাহিনী তাঁর আত্মজীবনের উপাদান নিয়ে লেখা । জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য এবং তাঁর প্রথম কন্যার ছায়াপাত পড়েছে অনেক গল্প-উপন্যাসে । বিয়ের পর দিল্লী ফিরে যাওয়ার কথা ছিল জীবনানন্দের, অধ্যক্ষকে কয়েক মাসের ছুটির কথাও বলেছিলেন । কিন্তু জীবনানন্দ আর ফিরে যাননি । ভেবেছিলেন কোলকাতায় কোন একটা চাকরী করে কাটিয়ে দেবেন । কর্মক্ষেত্রে বারে বারেই অন্যদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন । নিজের মনোবেদনা, বলা ভালো তাঁর জীবন দর্শন, তাঁর গল্প, উপন্যাসে নায়কদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলেছে । 'শ্রাবণ-ভাদ্রের বৃষ্টি ও রোদ । মেসের যাচ্ছেতাই খাওয়া । .... বয়স হয়ে গেছে, চাকরী নেই, শরীরের ধাত চিরকালই খারাপ, টিক্‌টিক্ করে মনটা ছিল, সেও গেছে যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে ।'[২] 'কারুবাসনা' উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে এরূপ ভাবনার মিল পাওয়া যায়। 'সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ না হয়। ঘুম কোনদিনও ফুরোয় না যেন আর ।'[৩]

জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'সংসারের পথ থেকে ভয় পেয়ে ফিরে এসে ..... চারদিকের আম, কাঁঠাল, লেবুর বন, জঙ্গল, মাঠ নিস্তব্ধতা, আষাঢ় শ্রাবণ রাতের মায়ার ভেতর খড়ের আটচালা ঘরখানা। যেন এখানেই কবির আশ্রয় ।'[৪] এই অর্থনৈতিক ক্লেশে পিষ্ট জীবনানন্দ ১৯৩৬ এ 'অন্ধকার' কবিতায় শীতের প্রেক্ষাপটে অন্ধকারময় জীবনের কথা ভেবে বললেন -- "ধান সিঁড়ির নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম -- পউষের রাতে -- / কোনোদিন আর জাগবো না জেনে / কোনোদিন জাগবো না আমি -- কোনোদিন জাগবো না আর --- / এ নীল কস্তুরী আভার চাঁদ, / তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও ।"[৫]

শুধু কবিতায় নয়, উপন্যাসেও কারুবাসনা কবিকে নিরস্ত করে দিয়েছে দুর্নিবার জীবিকার দহনে। ১৯৩৫ এর আগস্টে জীবনানন্দ যোগ দেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে । তিনি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না । বরিশাল শহরে কারো সঙ্গেই তাঁকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায় না । ক্লাসেও যে পড়াতেন তা অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর ভঙ্গিতে । অবসর সময়ে নিস্তব্ধ হয়ে বিশ্রামকক্ষের এক কোনে বসে থাকতেন । কলেজ শেষ হলে নিরালা পথ দিয়ে নির্জনে গৃহে ফিরতেন । মানুষের সঙ্গে না মিশলেও গভীরভাবে তাকিয়ে দেখেছেন তাদের জীবনযাত্রার রহস্যকে। প্রকৃতি ছিল তাঁর সব সময়ের সাথী । বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন -- 'প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি'[৬]। বনলতা সেন আলোচনাতে জীবনানন্দকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -- "আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র ।"[৭] এবং 'বনলতা সেন' বইটির আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, —"একজন চিরকালের কবিকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই, যার দেশ নেই, কাল নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ, দুঃখ,

---

১. জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন/সিগনেট প্রেস;কলকাতা-৭৩/অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ-১৪১০/ পৃ. - ১৪
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবনানন্দ দাশ কবি ও কবিতা / ভারত বুক এজেন্সি ঃ কলকাতা ৬/প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০১ / পৃষ্ঠা ৪৯
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৫০
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬২
৬. বুদ্ধদেব বসু ঃ কালের পুতুল / নিউ এজ, কলিকাতা - ৯, ১৯৯৭, মে, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬

সভ্যতার সমস্ত উত্থান পতন পার হয়ে যার সুর । আজকের মতো কোন এক বসন্ত প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে ঘা দেয়, আর মুহূর্তে উচ্চ নিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় ... ।"[১]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলোতে জীবন অনন্ত । তবুও কবিতাগুলি মৃত্যু চেতনায় পরিপূর্ণ । এ মৃত্যুর পরিণতি নেই, যেমন করে শীতের ক্ষয় নেই । কবিতাগুলি রূপকথার মতো । কবি দেখেছেন মানুষের সঙ্গে ফসলের মানুষ হয়ে ওঠার সংহতি। হেমন্তের শস্য উৎসবে দেখেছেন পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েরা ভাঁড়ে মদ নিয়ে মেতে উঠেছে। নাচে আর গানে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই শস্য উৎসব বলতে শুধু রূপসী বাংলার উৎসবকে নয়, এ দৃশ্য মহাযুদ্ধের পর ধবস্ত ভ্রষ্ট ইউরোপের আদিম মানুষদের (আফ্রিকা, ইণ্ডিয়ান, মালয়েশিয়া, জাভা দ্বীপের) নাচ গান চর্চার ছবিকে বোঝানো হয়েছে। ইয়েটস এলিয়টের কবিতায়ও এসব দৃশ্য দেখা গেছে।

'ক্যাম্পে' কবিতায় জীবনানন্দ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'এখানে জীবনানন্দের কবিতায় স্বয়ং সে নিয়তি প্রকৃতি, হয়ত বন কনজারর্ভেটার কাকার সূত্রে, হয়ত অপর কারো সঙ্গে এক বা একাধিকবার তিনি গেছেন, রাত্রিবাস করেছেন, শিকারের অভিজ্ঞতা -- জঙ্গল ভাঙ্গা শিকার নয়, হরিণ বা পাখি শিকারের, কখনো হয়তো ভাগ পেয়েছেন -- প্রথম যৌবনে, তিরিশের দশকেও এমন টুকরো অভিজ্ঞতা হয়ত তার হয়েছে ।'[২] -- আসাম জঙ্গলের ক্যাম্পের ঘটনাই বিবৃত হয়েছে -- 'ক্যাম্পে' কবিতায় । কারণ এ কবিতার 'খাই' শব্দটি অসমীয়া । 'সে এক শীতের রাতে -- জ্যোৎস্নার রাতে / প্রথম যৌবনে আমি কোনো এক শিকারীর সাথে / ক্যাম্পে ছিলাম শুয়ে আসামের জোকাই জঙ্গলে ।'[৩] শীত ঋতুতে ঘটে যাওয়া তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বসন্ত রাত্রির মায়াময় পরিবেশের পটভূমিতে ব্যক্ত করেছেন।

জীবনানন্দের অনেক আত্মকাহিনীই তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। দিল্লী কলেজে না ফিরে জীবনানন্দ কর্মহীনভাবে লেখায় মন দিলেন । ১৯৩৩ এ লেখা 'ক্ষমা-অক্ষমার অতীত' গল্পে নায়ক বলেছে -- 'তার বয়স চৌত্রিশ, বারো বছর আগে সে এম. এ. পাশ করেছে । বিয়ের আগে দু তিনটি কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছে এবং আরো অনেক কাজ করেছে। এমনকি স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে তার, তবু সে সংসারী হয়ে উঠতে পারে নি ।' আসলে জীবনানন্দ যেন এখানে নিজের কথাই লিখেছেন । 'বনলতা সেন'এর কবিতার লক্ষণগুলির মধ্যে কবির জীবনীসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় । 'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার ।'[৪] সেই কুড়ি বছর আগের অপূর্ণ প্রেমকে কবি কল্পনায় ফিরে পেতে চেয়েছেন । বাল্যপ্রেম, কুড়ি বছর আগের প্রথম বয়সীর ভালোবাসাকে তিনি ফিরে পেতে চেয়েছেন । ভিজে মেঘের দুপুর, বিরহী কল্প চিলের মতো ধানসিঁড়ি নদীর কাছে কবির কান্নার সুর বেরিয়ে এসেছে । সেই নায়িকার চোখকে বেতের ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির স্মৃতি আজও অচেতন হয়ে আছে। সে নদী হয়তো অনেকটা আজ মজে গেছে ।

আর একটি উপন্যাস 'কারুবাসনা'। এখানেও লেখকের আত্মজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। বনলতার সেই তথ্য কবি ১৯৩৩ এর গল্পে লিখেছেন। বাবার বন্ধু কেদার বাবুর মেয়ে ছিলেন বনলতা । 'কারুবাসনা' উপন্যাসে এই বনলতা হেমের পাশের বাড়ির মেয়ে হয়েছে । কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে সেন বনলতাদের খড়ের ঘরখানা যাতায়াত করেছে সে। কিন্তু তাদের আজ কোন চিহ্ন নেই । সে দেখেছে তাদের চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাককে উদ্দেশ্যহীনভাবে কলরব করতে । তাহলে কুড়ি বছর পর কি বনলতারা অন্য কোথাও বাসায় চলে গিয়েছিল। নাকি স্বামীর ঘর করতে

১.দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবনানন্দ দাশ কবি ও কবিতা / ভারত বুক এজেন্সি ঃ কলকাতা ৬/প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০১ / পৃষ্ঠা ৫৩
২.তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭
৩.তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮
৪.আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৫৩

গিয়েছিল কোন দূর দেশে ? অথবা এখানেই কি বনলতার মৃত্যু ঘটেছে -- এই সব নানা প্রশ্ন পাঠকের মননে জেগে ওঠে ।

জীবনানন্দ শঙ্খমালাকে যখন কবিতায় স্মৃতিচারণ করেছেন, ফিরে দেখেছেন, তখনই কবির মনে হয়েছে, দাহ হওয়ার পরের প্রেতিনী শঙ্খমালা। দাহের আগুনে পুড়েছে তার দক্ষিণ শিয়রে শুয়ে থাকা দেহ। কবির মনে হয় করুণ শঙ্খের মতো দুধে আর্দ্র স্তন কামনাতে অপূর্ণ হয়ে আছে । সে শঙ্খমালা নামক কিশোরীটি হতে পারে কবির কিশোরী প্রেমিকা । 'ঝরা পালক' এর নানা কবিতায় হয়তো এই হারানো প্রেমিকার ছায়াপাত ঘটেছে । ভাদরের ভিজা মাঠে আলেয়ার জ্বলন্ত শিখা দেখে কবির চিত্তে প্রিয়ার ছবি জেগে উঠেছে । 'কোন দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া / চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া ।"[১] 'রূপসী বাংলা'র অনেক কবিতাতেই এই শঙ্খমালার উল্লেখ করেছেন ।

কবি জীবনানন্দ ইতিহাস চেতনার সঙ্গে মিশিয়েছেন নানা ঋতু প্রসঙ্গকে। তাঁর কবিতায় দেখা যায় গ্রীস, রোম এসব দেশের প্রাচীন যুগের নাবিকেরা বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে ব্যস্ত ছিল। এই নৌশক্তি বিস্তারের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে 'বনলতা সেন' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের নানা কবিতায়। রয়েছে ইউরোপের উপনিবেশ বিস্তারের কথা । 'সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি / মনে হয় কোন এক বসন্তের রাতে ঃ ভূমধ্য সাগর ঘিরে যেই সব জাতি / তাহাদের সাথে ।'[২] নষ্টালজিয়া ভাবনা রূপসী বাংলার কবিতাগুলোতে রয়েছে। নস্টালজিয়া = (গ্রীক - nosos, ঘরে ফেরা talgos - দুঃখ যন্ত্রনা) -- রূপসী বাংলার কবিতাগুলোতে এভাবনা কাজ করেছে ।

প্রেমের কবিতার সংকলন গ্রন্থ 'বনলতা সেন' এ কাব্যের কবিতাগুলোতে রয়েছে প্রিয় মিলনের আকাঙ্খা। প্রেমের উত্তরণের পথে রয়েছে হেমন্ত ঋতুর কথা । 'কুড়ি বছর পরে', 'দুজন', আর 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতাগুলির পটভূমি হল হেমন্ত -- কার্ত্তিক বা অঘ্রাণ মাস । হেমন্ত ঋতু বা হেমন্ত মাস অধিক ব্যবহারের জন্য জীবনানন্দকে অনেকে 'হেমন্ত কবি' বলে থাকেন ।নতুন ধানরস বা সুধার, নবান্নের পরিপূর্ণতার ঋতু হল হেমন্ত । ধূসর পাণ্ডুলিপিতে হেমন্ত এসেছে স্পষ্টভাবে । সেখানে গেঁয়ো কবি দেখেছেন ফসলের মাঠে হেমন্তের উপস্থিতিতে 'কার্ত্তিকের মিঠা রোদে' মুখ পুড়ে যাচ্ছে। হেমন্ত লক্ষ্মীর অনিকেত ছায়াই পড়েছে কবিতায়। ঋতুচক্রের বিবতর্নের নিয়মে এক অসাধারণ কবিতা নির্মান করেছেন কবি । 'পাখিরা' কবিতায় দেখা যায় বসন্তে পাখির যে ডিম প্রথম জন্ম নিয়েছে, তারপর গোটা একবছর অতিক্রম করে সেই ডিম পাখি হয়ে পৌঁচেছে শীত ঋতুতে । এখানে শীত ঋতু জীবনের পরিপূর্ণতায় ভরপুর। শীতের আগমন অনুভব করে 'নাবিকী' কবিতায় কবি বলেছেন -- 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ।'

জীবনানন্দের সাহিত্যে ঋতুপরিচর্যার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ।শুধু তাই নয়, তিনি যেন আমি সত্ত্বার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির আত্মজীবনী রচনা করেছেন ।প্রকৃতি তো নিজে কিছু লিখতে পারে না, তাই জীবনানন্দ যেন প্রকৃতির আত্মজীবনীর রচয়িতা হয়ে উঠেছেন । বিশেষ করে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে প্রকৃতি প্রেমিক জীবনানন্দের সত্তাকে আমরা খুঁজে পাই ।এ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ---

> "সবচেয়ে গুরুত্বের এই যে প্রকৃতি ও আমি -- এ যেন একটির সহায়ক
> রূপে আর একটি, অর্থাৎ যুগ্মক, গ্রেইমাস (A.G. Greimas) যাকে

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২১
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭১

বলেছেন Actant, মেঘের থেকে যেমন বৃষ্টিকে আলাদা করা যায় না, শীতের থেকে যেমন কুয়াশাকে আলাদা করা যায় না -- 'রূপসী বাংলা'য় তেমনই প্রকৃতির কাছ থেকে আমি সত্তার রূপতন্ময়কেও কিছুতেই পৃথক করা সম্ভব নয় ।...... 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে দেখা যায় যে এই আমি সত্তাটি প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবার আশঙ্কায় যেমন গভীর বিষাদবোধে আচ্ছন্ন হয়েছে, তেমনই ভবিষ্যতে প্রকৃতির রূপকে ফিরে আসবার ঘোষণার মাধ্যমে অভ্যন্তরস্থ আনন্দময় অনুভূতিকেও প্রবলভাবে প্রকাশ করেছে ।"[১] --

প্রকৃতির সঙ্গে আবহমান সংযোগ স্থাপনের আনন্দ --- "আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে -- এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় -- হয়তো বা / শঙ্খচিল শালিখের বেশে; /হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার / বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ।"[২]

প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার মানস যন্ত্রনা --- "কোথায় চলিয়া যাব একদিন;-- তারপর রাত্রির আকাশ / অসত্তা নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি; / ....-- শরতের রোদের বিলাস / কতকাল নিঙড়াবে .... গো রচনা জিনি রং চিনিব না কিছু ----"[৩]

কাল দ্বারা চালিত এই পৃথিবীতে আমি সত্তা নানাভাবে প্রকাশিত হয় । নানারূপে নানা স্বরূপে বিন্যস্ত এই আমি সত্তা বিভিন্ন চেতনাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে। কখনও বিড়াল, কখনও ইঁদুর, কখনো ঘাস, কখনও পেঁচা ইত্যাদি হয়ে ওঠে । এই জীবনানন্দের আমি সত্তা নানা নামগ্রহন করে আবার কখনও সংকেতের উপর ভর করে প্রেম -প্রকৃতি - সময় - ইতিহাস সব কিছুর গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়েছে। আমি বাচক ইঙ্গিতে ঋতু চেতনাকে প্রকাশ করেছেন কবি জীবনানন্দ -- "আমি তবুওতো -- সৃষ্টির হৃদয়ে হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল"[৪]

জীবনানন্দের কবিতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মৃত্যু । হেমন্ত ঋতুর প্রতীকে, ফসল শূন্য মাঠের প্রতীকে, ডুবন্ত চাঁদের প্রতীকে, ডানা ভাঙা হিম নিরুদ্দেশের প্রতীকে তাঁর কবিতায় মৃত্যুচেতনা বারবার এসেছে । তাঁর কবিতার প্রেক্ষাপটে মৃত্যুচেতনা যেন একটি বিশেষ চরিত্র হয়ে উঠেছে । আর এই মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন হেমন্ত ও শীত ঋতুর আবহে ।

'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে মৃত্যুচেতনার ইঙ্গিত । পালক ঝরে যাবার অর্থ হল নিঃশব্দে মৃত্যুকে গ্রহণ করা । ঝরা ফসলের গানের মধ্যে মৃত্যু ইঙ্গিতই পরিস্ফুট হয়েছে । 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের 'শ্মশান' কবিতায় শ্মশানের ভয়ংকর রূপ বর্ণনায় মৃত্যুচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সঙ্গে মৃত্যুর প্রতীক রূপে ধরা দিয়েছে 'পাতাঝরা হেমন্তের স্বর'[৫] । 'ধূসরপাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, শুধু মানুষেরই মৃত্যু ঘটে না, নক্ষত্র-আগুন-ধানক্ষেত-শিশির - গাছ-ফুল সবকিছুরই মৃত্যু ঘটে । এমনকি পৃথিবীও একদিন বুড়ো হয়ে মৃত্যুতে ধবংস হবে । 'জীবন' কবিতায় তিনি মৃত্যুকে অনুভব করেছেন এবং লিখেছেন -- "তবুও ইশারা করে ফাল্গুন রাতের গন্ধে বয়ে / মৃত্যুরে তার সেই কবরের গহবরে আঁধারে / জীবন ডাকিতে

১. জহর সেন মজুমদার ঃ জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য / মডেল পাবলিশিং, কলিকাতা ৭৩ / প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৫ /পৃষ্ঠা ৯২

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১২৬

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৮

৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৭

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬

আসে;— হয় নাই গিয়েছে যা হয়ে, / মৃত্যুরেও ডাকে তুমি সেই ব্যথা আকাঙ্খার অস্থিরতা লয়ে ।”[১]

‘সাতটি তারার তিমির’ গ্রন্থেও মৃত্যু নেমে এসেছে মূল্যবোধহীন অবিবেকী মানুষের মধ্যে । ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ কাব্যগ্রন্থের মৃত্যু এসেছে সমষ্টি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যাকে কেন্দ্র করে । ‘প্রয়ানপটভূমি’, ‘হেমন্তরাতে’ এসব কবিতায় মানবসভ্যতাকে ঘিরে মৃত্যুভাবনা ফুটে উঠেছে । এ কবিতা দুটিতে মৃত্যুভাবনার অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে হেমন্ত ঋতু । জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যু চেতনার অর্থ শুধু ব্যক্তির নিজস্ব মৃত্যু নয়, এই মৃত্যুর মধ্যে জীবনানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেমের, এমনকি মানুষের সঙ্গে পৃথিবীরও বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয় । ‘রূপসী বাংলা’তে কবি ঘুমকে মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন । তিনি বিশ্বাস করেন, মৃত্যু সাময়িকভাবে ইহজীবনে ছেদ তৈরী করলেও মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় জন্ম নিয়ে পৃথিবী লোকেই ফিরে আসে । তাই কবি তাঁর ভালোলাগার ঋতু হেমন্তেই আবার ফিরে আসতে চেয়েছেন ।

বছরের পর বছর, গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত পর্যন্ত ঋতুর মহাপ্রবাহ চলতে থাকে নিরন্তর । তিনি কবিতাগুলিতে ঋতুক্রমকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার সময় ক্রমটি এরকম ---

ক) ‘আরেকটি প্রভাতের ইশারায়’

খ) ‘রৌদ্রে ফের উড়ে যায়’

গ) ‘সোনালি রোদের ঢেউয়ে’

ঘ) ‘হেমন্তের বিকেলের’

ঙ) ‘ফাল্গুনের রাতের আঁধারে ’

এ কবিতাতে দেখা যায় - ঋতুর মধুর প্রেক্ষাপটে যখন জীবনকে গভীর ভালোবেসে বধূ ও শিশুকে নিয়ে সময় অতিবাহিত করতে চেয়েছে । ঠিক তখনই মানুষটির মনে আত্মঘাতী হওয়ার বাসনা জেগে উঠেছে। তার জীবনের ভাঁড়ারকে শূন্য করে দিতে চেয়েছে। অথচ জীবনানন্দ লিখেছেন- ‘হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে / এজীবনে কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ....’। তবে ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যের, এ কবিতার মানুষটি যেন এক অন্ধঝোঁকে মৃত্যুকে খুঁজে চলেছে । জীবন হয়ে উঠেছে তাই তাঁর কাছে এক ঘেঁয়ে । হেমন্ত-শীত-বসন্ত কোন ঋতুর প্রেক্ষাপটই মানুষটিকে বেঁচে থাকার স্বাদ তৈরি করে দিতে পারলো না। এ কবিতার সূত্রেই জীবনানন্দ যেন বুঝিয়ে দিলেন, জীবনের কাছ থেকে যেমন পালানো যায় না, তেমনই মৃত্যুর কাছ থেকেও পালানো যায় না ।

জীবনানন্দের কবিতায়- উপন্যাসে- গল্পে এক প্রেম প্রত্যাশী পুরুষকে দেখতে পাই । যে প্রেমিক পুরুষটি তার প্রিয়াকে হারিয়েছে । অথবা কখনো কখনো প্রেমিক পুরুষটি নারীর উপর আস্থা বা বিশ্বাস হারিয়েছে। তবুও এই প্রেমিক পুরুষটি কত ঋতুকাল ধরে যাত্রা করেছে প্রিয়ার অন্বেষণে । অনেকে মনে করে থাকেন কবির জীবনেই নিহিত আছে সেই বিরহী প্রেমাকাঙ্খার সত্তাটি । পঞ্চাশের কবি আলোক সরকারের স্ত্রী মিনু সরকার একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন ---

“লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দের স্ত্রী ও আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন । তাঁর মুখে জীবনানন্দ সম্বন্ধে

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৯৫

অনেক অভিযোগ শুনেছি । .... লাবন্য দাশ অতি সাধারণ বাঙালী মহিলা ছিলেন, জীবনে সুখ স্বচ্ছলতা এবং সবার উপরে একজন স্বাভাবিক মানুষকে চেয়েছিলেন যিনি অন্য সব স্বামীর মতো নিজের জীবন, স্ত্রীকে ঘিরেই গড়ে তুলবেন । .... মা বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা, ভাইবোনদের জন্য নিবিড় স্নেহ প্রীতি, ছেলেমেয়েদের জন্য আর উৎকণ্ঠা। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি জীবনানন্দের আচরণে কোথাও একটা নিঃশব্দ উদাসীনতা লক্ষ্য করতেন লাবণ্য । .... জীবনানন্দের কিছু কবিতায়, বিশেষ করে উপন্যাসে বিবাহিত স্ত্রী তথা ব্যক্তি নারীর প্রতি কখনো কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দেখা যায় । .... তবে এটা উল্লেখ করবো লাবণ্য দাশের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি যে জীবনানন্দের বিবাহিত জীবন যেমন সুখের ছিল না, তেমনই সুখের ছিল না লাবণ্য দাশের দাম্পত্য জীবনও ।"[১]

'ঝরাপালকে'র 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' -- কবিতায় প্রিয়ার অনুসন্ধানে প্রেমিক তথা কবি বলেছেন --- 'একদিন খুঁজেছিনু যারে / বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি আঁধারে, / .... যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে / হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছি ঝরো ঝরো / কামিনীর ব্যথার শিয়রে।"[২]

উপন্যাস 'পূর্ণিমা'তে জীবনানন্দ জানিয়েছেন পরিচিত জগতের আর পাঁচটা নারীর মতোই খুব সাধারণ চাহিদা ছিল পূর্ণিমার জীবনে । তবুও পূর্ণিমার মতো নারীরাই মৃত্যুমুখী হয় । পূর্ণিমার বেঁচে থাকার অস্তিত্ব সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন --- "শীতরাতের অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের জীবন থেকে পূর্ণিমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছে সন্তোষ; পূর্ণিমা বেঁচে থাক, কী মরে যাক -- সন্তোষের জীবনকে সে যেন আর স্পর্শ না করে ।"[৩]

প্রেম প্রত্যাশী কবি কোন এক রূপসী নারীকে ভালোবেসেছিলেন, তার জন্য আজও তিনি প্রতীক্ষা করেন -- 'রূপসী বাংলা' তে কবি বলেছেন --

> "পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে,
> পউষের শেষ রাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে ।
> আমাদের দেশে ফিরে এল; ....
> পউষের শেষরাতে নিম পেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে --"[৪]

'প্রেতনীর রূপকথা' উপন্যাসে প্রেমিক সুকুমার ভালোবাসার নারী বিনতার জন্য অপেক্ষা করে। প্রকৃতির মাঝে আজও বিনতাকে খুঁজে বেড়ায় । 'কারুবাসনা' উপন্যাসে জীবনানন্দ দেখিয়েছেন স্ত্রী কল্যাণী, কন্যা খুকুরাণী ও পিতা-মাতার সঙ্গে সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ থাকার পরও বহু বছর আগের প্রথম ভালোবাসার কথা ভেবে মন রোমান্টিক হয়ে ওঠে হেমের। বিশেষ করে বর্ষা প্রকৃতির পরিবেশ হেমকে রোমান্টিক করে তুলেছে। হেমের মনে হয়েছে-- 'কিশোর বেলায় যে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে .... আজ সেই যেন পূর্ণ যৌবনের উত্তর আকাশের দিগাঙ্গনা সেজে এসেছে ।"[১] জীবনানন্দ তাঁর নারীকে নির্মান করেছেন প্রকৃতির উপাদান দিয়ে । বিশেষত ঋতুর আবহ মাখিয়ে নারীর

---

১. জহর সেন মজুমদার ঃ জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য / মডেল পাবলিশিং, কলিকাতা ৭৩ / প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৫ /পৃষ্ঠা ১৫৫

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪

৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৭

সুন্দর রূপকে কবি তৈরী করেছেন -- "হলুদ রঙের শাড়ী, চোর কাঁটা বিঁধে আছে / এলোমেলো অঘ্রাণের খড় চারিদিকে/ শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর / চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির/ -- প্রেমিকের মনে হলো : এই নারী অপরূপ - খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;"[২]

'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ের 'তোমাকে' কবিতায় জীবনানন্দ নারীকে দেখেছেন শীতের আবহ মিশিয়ে, কোন এক শরৎ সময়ে । এখানে কবি বলেন - 'তবু/অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে/ আশ্বিনে এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হলে / বলে : আমি রোদ কি ধূলো পাখি না কি সেই নারী ?'[৩]

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় -- উপন্যাসে -- গল্পে চিত্রকল্প নির্মানে ঋতুর বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করেছেন । 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলিতে ঋতুকেন্দ্রিক চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে। চাষা তার সৃষ্টির ফসল নিয়ে ঘরে গেছে । ফসল শূন্য ফাঁকা মাঠে শিশিরের জল ঝরে পড়েছে । অঘ্রাণের নদীর শ্বাসে বাঁশপাতা ও মরা ঘাস হিম হয়ে যাচ্ছে । কুয়াশা ও ক্রম পরিণতিতে খুনী শীতের রূপ পরিগ্রহণ করেছে । জীবনানন্দ এমনই সুন্দর একটি চিত্রপ্রধান দৃশ্য নির্মান করেছেন 'পেঁচা' কবিতাতে - "প্রথম ফসল গেছে ঘরে, / হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে / শুধু শিশিরের জল;/ অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে /হিম হয়ে আসে / বাঁশপাতা-মরাঘাস-আকাশের তারা !/ বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফুয়ারা / ধানক্ষেতে মাঠে / জমিছে ধোঁয়াটে / ধারালো কুয়াশা ! / ঘরে গেছে চাষা ।"[৪]

যন্ত্রনা বিধূর ঋতু চেতনার স্বরূপ উন্মোচনেও জীবনানন্দ দক্ষতা দেখিয়েছেন। --

"হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে
এরকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়,
মাঠের ফসলগুলো বারবার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে ।
মৃত্তিকার ঐ দিক আকাশের মুখোমুখি যেন সাদা মেঘের প্রতি,
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, ঘাতক;
কিছু নেই -- তবুও অপেক্ষাতুর;"[৫]

পৃথিবীর ভাঁড়ার থেকে হেমন্তের ফুরিয়ে যাওয়ার অর্থ ফসলহীনতা বা মহাশূন্যতারই আগমন ঘটেছে। জীবনানন্দ ফসলশূন্য বন্ধ্যাত্ব মাঠের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছেন নির্মল সাদা মেঘের বিচরণ। আবার অন্যদিকে দেখতে পেয়েছেন সময় চেতনাকে যন্ত্রনাময় করতে উপস্থিত হয়েছে ঋণ-রক্ত-ইতরতা এবং ঘাতক-লোকসান মিলিয়ে সমস্ত রকম শোষন চক্র । 'সময়ের কুয়াশা'-- এই চিত্রকল্পের গভীরতার দ্বারা এক স্বপ্নাচ্ছন্ন আবহমান মানবাত্মার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ।

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২৩১
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৬
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৫

'পিরামিড' একটি অচরিতার্থ প্রেমের কবিতা ।প্রত্যাশা পূরণ না হবার কবিতা ।জীবনের ক্ষণিকত্ব অনুভব করে এখানে জীবনানন্দ বেদনাবোধক মৃত্যুকে মেনে নিয়েছেন শেষপর্যন্ত । যে জীবন মাধবীর গান নিয়ে নবোৎফুল্ল, সেই জীবনেই অনিবার্য নিয়মে উপস্থিত হয় পাতা ঝরা হেমন্ত, যা মৃত্যুকেই কেবল সূচিত করে। হিমগর্ভ কবর বা স্থবির পিরামিড মৃত্যুর নিষ্ঠুর উদ্ধ ত জয়গর্বকেই প্রকাশ করেছে। নিষ্ফলতার বেদনায় ব্যথিত জীবনানন্দ দেখেছেন যুগ যুগান্তরের শ্মশানের ছাই । তিনি অনুভব করেছেন -- জীবন দুদিনের জন্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। তাই বলেছেন -- "হেমন্তের বিদায় কুহেলী -- / অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি / গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান / দু'দিনের তরে শুধু;"[১]

জীবনানন্দ দেখিয়েছেন মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জাগরণ ঘটাতে ঋতুর উপস্থিতি উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে ।এইধরণের জৈব স্বাদে ভরপুর একটি কবিতা হল 'পাখিরা' । তিনি বসন্ত রাত্রির পটভূমিতে ইন্দ্রিয় কামনাকে জৈব স্বাদে ভরপুর করে তুলেছেন 'পাখিরা' কবিতায়। এই কবিতার শুরুতে রয়েছে 'ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে -- / বসন্তের রাতে / বিছানায় শুয়ে আছি;/ এখন সে কত রাত ! / ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর, / স্কাইলাইট মাথার উপর / আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর ।"[২]-- গভীর রাত্রি হল বিশ্রাম ও নিদ্রার সুসময়। কবিতার নায়ক এখানে তন্দ্রহীনতায় পীড়িত হয়েছে। কবিনায়ক বুঝতে পেরেছে বসন্ত বিরাজমান, তবুও কিছুতেই ঘুমোতে পারছেন না । আমরা জানি বসন্ত মানেই প্রকৃতিতে ও মানবের মনে আনন্দের সমারোহ চলে। বসন্ত এমন এক ঋতু যার মধ্যে অবসাদ, ক্লান্তি ও বার্ধক্যের কোন চিহ্ন নেই। এমন বসন্তের রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কবিনায়ক জাগ্রত। শুধু তাই নয় নায়ক বুঝেছে বসন্তের মিলন মুহূর্তে পাখিরা জীবনের স্বাদে পরিপূর্ণ । ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান আনতে প্রস্তুত হয়েছে পাখিরা। 'তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়'[৩] । কবিনায়ক অনুভব করেছেন যে, পাখিদের প্রিয় ও প্রিয়ারা ঘনিষ্ঠভাবে উড়ন্ত পরিক্রমা করছে । বসন্ত রাত্রির মিলন উন্মাদনাকে অনুভব করে নিঃসঙ্গ কবিনায়ক ঘুমোতে পারছেন না ।

জীবনানন্দের অনেক কবিতা ইয়েটেসের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত । ইয়েটস রচিত 'The cat and the moon'[৪] কবিতার ভাবনার সঙ্গে জীবনানন্দের 'বিড়াল' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । ইয়েটসের এই কবিতায় বিড়াল, চাঁদ ও ঘাসের মধ্যে রহস্যঘন নৃত্য লক্ষ্য করা যায় । জীবনানন্দ রচিত 'বিড়াল' কবিতার বিড়ালটিও রহস্যময় । হেমন্তের সন্ধ্যায় বিড়াল তার সাদা থাবা বুলিয়ে দিয়েছে সূর্যের শরীরে এবং তারপরই সে ছোট ছোট বলের মতো অন্ধকারকে রহস্যময় খেলার ছলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে ।

ইয়েটসের 'The falling of the leaves' কবিতাটির মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর শরৎ ঋতুর কথা। কিন্তু শুরুতেই ইয়েটস বলেছেন --'Autumn is over' । শরতের বিদায় মানেই প্রকৃতি সংলগ্ন মানবমনে শূন্যতার সৃষ্টি ।

"A autumn is over the long leaves that love us,
And over the mice in the barley sheveas;
Yellow the leaves of the rowan above us,
And yellow the wet weld-strawberry leaves."[১]

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৪০
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১১০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১১০
৪. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 39

ইয়েটস দেখেছেন, শিশির পড়ার পর স্ট্রবেরি পাতা ভিজে গেছে এবং হলুদ হয়ে এসেছে। যে সবুজ পাতা সবুজে তাজা ছিল, তা প্রাকৃতিক নিয়মে হলুদ বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। জীবনানন্দও 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় চিত্রকল্প আঁকতে গিয়ে লিখেছেন -- 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ, / হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা, / ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ ....।"[২] আসলে জীবনানন্দ শরৎ ঋতুর মৃত্যুকে তুলে ধরেছেন প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে। ইয়েটস এবং জীবানানন্দ -- উভয়ের ঋতু ভাবনা যে কত নিবিড়তর এ কবিতায় তার প্রমান পাই। ইয়েটসের কবিতায় ঋতুর নিঃশব্দ বহমানতাকে ধারণ করেছেন জীবনানন্দ। ইয়েটস্ বলেছেন ---

"And over the mice in the barley sheveas;
And Yellow the leaves of the rowan above ......"[৩]

এর যেন সঠিক ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে জীবনানন্দের কবিমনে -- "ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ ..... "

জীবনানন্দের ঋতু চেতনা পঞ্চাশ-ষাট দশকের কবিতাগুলির বিভিন্ন পঙক্তিমালায় সমাদৃত। এমন কিছু কবিতা রয়েছে, যে সব কবিতার ভাবনায় জীবনানন্দ উজ্জ্বল। জীবনানন্দের ভাবনাকে তাই আত্মসাৎ করেছে পরবর্তী কবিরাও।

জীবনানন্দ ঃ "আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবে কার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব;"[৪]

অথবা জীবনানন্দের আর একটি কবিতা --

'ঘুমে চোখ যায় না জড়াতে --
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;
-- এখন সে কতো রাত।'[৫]

জীবনানন্দের এই ঋতু ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কবি যুগান্তর চক্রবর্তী লিখেছেন 'সারারাত চৈত্র বাতাসের শব্দ' কবিতা-- "সারারাত চৈত্র বাতাসের শব্দ, / সারারাত ঘুমের বিরুদ্ধে / জেগে থাকিবার বিরুদ্ধতা / সারারাত শব্দের দুরত্বে / শাদাপাতা, শুধু শাদা পাতা।"[৬] জীবনানন্দকেই অনুভব করে পরবর্তী কবিরা স্বপ্ন, নক্ষত্র, ঋতু কেন্দ্রিক ভাবনার বলয় কবিতায় নির্মান করেছেন। কবিতায় যে সব চিত্রদৃশ্য রচনা করেছেন তাও জীবনানন্দ অনুসারী। জীবনানন্দের কবিতা প্রভাত চৌধুরীকেও আবিষ্ট করে তুলেছে। 'কার্তিকের জ্যোৎস্না', 'কার্তিকের আকাশ', কিংবা এ কবির কবিতায় পাই এমনই কতগুলি চিত্রদৃশ্য -- "শিশিরকে ভালোবেসে মধ্যরাত্রে ডাক দেয় আহা শিশিরের জল / টুপ্টাপ্ শিশিরের জল পড়ে মধ্যরাত্রে অন্ধকার ছুঁয়ে / আজ মাঝ রাতে পেঁচার হাসির মতো জ্যোৎস্না নামে / জ্যোৎস্নার ভিতর এক পেঁচা

---

১. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 85
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১১২
৩. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 71
৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১১২
৫. তদেব;পৃ. - ১১০
৬. জহর সেন মজুমদার ঃ জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য / মডেল পাবলিশিং, কলিকাতা ৭৩ / প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৫ /পৃষ্ঠা ৩৭৯

ডাকে - পেঁচা কাঁদে - দারুণ তৃষ্ণায় / পেঁচা ও জ্যোৎস্নার ভিতর সাদৃশ্য পেয়েছি বহু উপমার গুণ / যেমন পেয়েছে আগে প্রিয় মহিলার মুখের সাদৃশ্যে চাঁদ .....”[১] চিত্ররূপময় কবিতার সৌন্দর্য দেখে সমালোচক লিখেছেন —

> “জীবনানন্দের কবিতা থেকেই প্রভাত চৌধুরী নিয়েছেন উট-পেঁচা-মশা-ইঁদুরকে। নিয়েছেন চাঁদ-নক্ষত্র-ধানশীষ - কার্ত্তিক - শিশিরের জল-জ্যোৎস্না - ঘুম ইত্যাদি সবিশেষ অনুষঙ্গ।”[২]

জীবনানন্দের কাব্যে দেখা যায় অবিরত নূতন নূতন ক্ষেত্রের অন্বেষণ। “ঝরাপালকে’র কবি যেন আত্মচারী, উচ্ছ্বাসী, নিতান্তই কিশোর পদ্যকার। রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের’ চেয়েও জীবনানন্দ এখানে অনেক বেশী আত্ম আবিষ্কারের চেষ্টায় রত। “কোন এক নতুন কিছুর / আছে প্রয়োজন / তাই আমি আসিয়াছি, -- আমার মতন / আর নেই কেউ ! / সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ / আজিকার;” --- (কয়েকটি লাইন)। এখানে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে পৃথিবী নয়, প্রকৃতি নয়, প্রিয়া নয়, কবিও নয় -- শুদ্ধ প্রেমই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয় চেতনা দিয়ে চমকে দেওয়া এক অপরূপ জগৎ নির্মান করেছেন তিনি।

> “মহাপৃথিবীতে আবার ব্যাপ্তির সাধনা। গ্রামীন বাংলার পটভূমি তার ঋতু বৈচিত্র্য তার প্রেম ও বিষাদ পেরিয়ে কবি এবার নাগরিক যান্ত্রিক জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। এই বিশ্ব যদিও বিরাট ও বিচিত্র তবু আবহমানের নয়। চলমান ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র।”[৩]

‘মহাপৃথিবী’তে মানুষের জীবন অসহ, ক্লান্তিকর, ভারাতুর। মৃত্যু এখানে অনিবার্যভাবেই আকাঙ্ক্ষিত, আরোপিত ও আকস্মিক হয়ে উঠেছে। ‘রূপসী বাংলা’তেও মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু সেখানে জীবন যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ, মৃত্যুও তেমনি সুন্দর শোভাময় হয়ে উঠেছে। ‘ঝরাপালকে’ কবি প্রেমকে দেশকাল - বিচ্ছিন্ন বহু জীবনের মধ্যে উপভোগ করেছেন। ‘রূপসী বাংলা’য় তিনি প্রেমকে উপলব্ধি করেছেন বহু যুগে, বিস্মৃত দেশে এবং দেশের জীবন ও আত্মার মধ্যে। ‘বনলতা সেন’ কাব্যে কবি অনুভব করেছেন হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চ রণশীল অবিনাশী এক প্রেম সত্তাকে। তিনি বলতে চেয়েছেন বহুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে যে প্রেমসত্ত্বা নিহিত আছে, তাদের প্রেম চিরকাল জাগরিত হয়ে থাকবে। আজকের মানুষ হয়ত থাকবে না, কিন্তু বেঁচে থাকবে এই প্রেমের খেলা।

ঋতু সম্পর্কে জীবনানন্দের যে ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর কাব্য জগতে, তা বিশ্লেষণ করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক অম্বুজ বসু। তিনি বলেছেন -- “ঝরাপালক যদি স্বপ্ন - প্রয়ানের ঋতু, ধূসর পাণ্ডুলিপি - মহাপৃথিবী - বনলতা সেন, তবে কবি চেতনার গোলাপী গোধূলি। চেতনার গভীর হৃদয়ের জিজ্ঞাসা - অন্তর্দ্বন্দ্ব - ক্ষোভ, বিদ্রূপ- বেদনা- সন্ধান এই নিয়ে এ ঋতুর চরিত্র। কিন্তু সব জড়িয়ে, সব ছাপিয়ে রয়েছে এক ইন্দ্রিয় লগ্ন স্বপ্নিল সৌন্দর্য্যের বলয়।”[১]

হেমন্ত প্রিয় কবি জীবনানন্দ। কবিতায় বর্ণিত জীবনের পরিণত অধ্যায়ে এসে, রক্তের মধ্যে বয়সের শৈত্যকে অনুভব করেননি কখনো, বরং নতুন বসন্তের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। ‘বেলা-অবেলা-কালবেলা’

---

১. জহর সেন মজুমদার ঃ জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য / মডেল পাবলিশিং, কলিকাতা ৭৩ / প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৫ /পৃষ্ঠা ৩৮০

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮৫

৩. অম্বুজ বসু ঃ একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণি ঃ কলকাতা ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১১ / পৃষ্ঠা ৩৬

পর্যায়ের 'সামান্য মানুষ' কবিতাতে ঋতু পরিক্রমার একটি সুন্দর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অতীতের প্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্য, বর্তমানের আত্মদংশনের জ্বালা এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুমুখীনতার মধ্যে কবিতাটির আবেগ গভীর হয়ে উঠেছে ---

"আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান;
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকাল বেলায়,
এক হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে; তবুও আবার কেটে যায়
আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর;
সে আজ নেই এ পৃথিবীতে;
অথবা কুয়াশা এসে - ওপারে তাকালে
এ-রকম অঘ্রাণের শীতে ।
....
প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে সব
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি পলিটিক্স
জ্ঞান বিজ্ঞানে আর এক রকম শ্রীছাঁদ ।
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে --
সে আর সপ্তমী তিথি : চাঁদ ।"[২]

বাইরের শীতকে অগ্রাহ্য করে জীবনানন্দ সৌন্দর্যের, বসন্তের মধুরতাকে প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করেছেন। অকাল বসন্তের হাওয়া লেগে কবির মনোভূমি প্রাণোন্মদনায় মুখর হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের প্রেম-ব্যথা-স্মৃতি - আনন্দের অনুষঙ্গে প্রকৃতির রূপ-রস-রঙের রেখা নির্মিত হয়েছে। শরীরী আবেগের চমকপ্রদ প্রকাশও ঘটিয়েছেন কবিতায় । কবি জীবনানন্দ জৈবশক্তির আকাঙ্খাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে নির্দিষ্ট করেছেন ঋতুর উপস্থিতিকে । যেমন কোন এক শীতের রাতে মুমূর্ষু পরিচিতির বিছানায় কমলালেবুর করুণ হিম মাংস নিয়ে আসবার আকাঙ্খাতো শরীরী আবেগকেই প্রকাশ করে । —

"আবার যেন ফিরে আসি
কোন এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে ।"[৩]

উল্টো দিক দিয়ে জীবনানন্দ 'মৃণাল' উপন্যাসেও মুমূর্ষু নারী মৃণালের শরীরী আকাঙ্খাকে প্রকাশ করেছেন । এই উপন্যাসের শরীরী আকাঙ্খাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক শীত ঋতুকেই গ্রহণ করেছেন । শীত ঋতু একদিকে ক্ষয়ের প্রতীক এবং অন্যদিকে জৈবশক্তির নির্দেশক হয়ে উঠেছে । ---

"সমস্ত শরীর ও থরথর করে কাঁপছে যেন । এমনি করে পাঁচ-দশ মিনিট
কেটে গেল । তারপর চোখ মেলে মৃণাল - 'বড্ড শীত করছে ।' -- আর
একটা কম্বল চাপিয়ে দিই?'

---

১. অম্বুজ বসু ঃ একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণি ঃ কলকাতা ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১১ / পৃষ্ঠা ৬৩
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২৬১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৪

'দাও' ....

মৃণাল আস্তে আস্তে আঙুল বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে একটা শান্ত নিঃশ্বাস ফেলল ।

তারপর বলল -- 'কয়েকটা বেদানার কোয়া দাও তো আমাকে ।'

চার-পাঁচটা দানা মুখের ভিতর ছেড়ে দিলাম ।

মৃণাল -- 'থাক আর দিও না, আগে খেয়ে নি ।"[১]

বাংলার বুকে বিরাজমান ছয় ঋতুর মধ্যে কবি জীবনানন্দ হেমন্ত ঋতুকেই গাঢ়ভাবে অনুভব করেছেন। ছয় ঋতুর কোলাহলের ভিড়ে হেমন্ত যেন লাজুক ছেলে, তাই তার উপর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় খুব সহজেই । আমাদের কাছে হেমন্ত খুব অপরিচিত । এই হেমন্তকেই জীবনানন্দ বন্দী করেছেন তাঁর সাহিত্যে। হেমন্তের শিশির সিক্ততায় কবি শুনেছেন বিচ্ছেদের সুর । ব্যথাতুর হৃদয়ে কবিও লেখেন -- "মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা-তোমার; / ডেকেছিলো ভিজে ঘাস, -- / হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড় !'[২] 'পিরামিড' কবিতায় এই হেমন্ত এসেছে মৃত্যু, বিচ্ছেদ ও ব্যথার নগ্নরূপ হয়ে --- 'মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা ঝরা / হেমন্তের বিদায় কুহেলী / অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি / গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান / দুদিনের তরে শুধু;"[৩]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এই বিষণ্ণ বিচ্ছেদের হেমন্ত ঋতু পরিপূর্ণ ফসলের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শরীরী ক্লান্তির অবসাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায় । সন্তান সম্ভবা নারীর অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছিলেন কালিদাস । তিনি 'রঘুবংশ' কাব্যে গর্ভিনী সুদক্ষিণার রূপের বর্ণনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন । কবি জীবনানন্দও হেমন্তে গর্ভবতী ধান্য নারীর সৌন্দর্য্য অঙ্কন করেছেন 'অবসরের গান' কবিতায় ---

"হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে ---
দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে ।"

অথবা --

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই -- শুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই, -- রূপ ঝরে পড়ে তার, --
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ।"[৪]

'বনলতা সেন' কাব্যে অতীত প্রেমের স্মৃতি মন্থনে হেমন্ত ঋতু সকরুণ হয়ে উঠেছে। 'মহাপৃথিবী'তে হেমন্ত জীবন আস্বাদে ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও মানুষটির বেঁচে থাকতে অসহ্য মনে হয়েছিল । কবির প্রশ্ন --

"জীবনের এই স্বাদ - সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের --
তোমার অসহ্য বোধ হলো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো ?"[১]

'সাতটি তারার তিমির' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'তে হেমন্ত ঋতুর ব্যবহার জীবনানন্দ সংহত ও প্রতীকীভাবে করেছেন । সমালোচক জীবনানন্দের হেমন্তপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন --- "হেমন্তের এই রূপ, এই রূপের এই বিচিত্র মাদকতা জীবনানন্দই প্রথম আবিষ্কার করলেন । ... আর জীবনানন্দ শুধু

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ১৮৮
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৪৮
৩. তদেব ;পৃ. - ৪০
৪. তদেব ;পৃ. - ৮১

হেমন্তের কবিতা লিখলেন, হেমন্তের কবিতা ছাড়া আর প্রায় কিছুই লিখলেন না । শুধু তাই নয় -- এই একটি ঋতুই তাঁর হাতে কত রূপে ধরা দিল । হেমন্তের রূপের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের মিশ্রণ আছে । এ একাধারে ফসল ও ফাঁকা মাঠ, পূর্ণতা ও রিক্ততা, জীবন-মৃত্যুর ঋতু । তাঁর কবিতার সূচনা থেকেই হেমন্তকে কবি কতরূপে চিনলেন, চেনালেন ।"[২]

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত- শীত ও বসন্ত প্রতিটি ঋতুর বৈচিত্র্য অনুভব করে কবি জীবনানন্দ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কবিতায় উপস্থিত করেছেন । বাল্য জীবন যেহেতু বাংলাদেশে কাটিয়েছেন, সেহেতু তিনি বাংলার বুকে ষড়ঋতুর সমাবেশকে স্পষ্টত লক্ষ্য করেছেন । ঋতুর রূপে মুগ্ধ কবি তাঁর মৃত্যু কামনা করেছেন এই রূপসী বাংলার বুকে । যে বাংলার নিশুতি জ্যোৎস্নার রাতের ভিতর কবি শুনেছেন -- 'টুপটুপ্ টুপ্টাপ্ সারারাত ঝরে শুনেছি শিশিরগুলো'[৩] -- (পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত / রূপসী বাংলা) -- 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ে লেখা কবিতাগুলিতে এসেছে ক্লান্ত পৃথিবীর ইতিহাস। এ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে ঋতুর রমণীয় সৌন্দর্য্য এখানে নষ্ট হয়ে গেছে ।

জীবনানন্দের কাব্যে হেমন্ত ঋতুর রূপ বিষণ্ণ, উদাস প্রকৃতির। হিমেল ধূসর রঙে আঁকা হেমন্তের মুখ। বর্ষার মতো যৌবন মদির রূপের বিলাস হেমন্তের মধ্যে নেই । নেই শরতের মতো প্রসন্ন বৈভবও । তবে হেমন্তের মধ্যে প্রশান্তি রয়েছে । আছে সুদূর ব্যাপ্ত বৈরাগ্যের বিষণ্ণতা । এ সময় কৃষক পল্লীর পথে পথে আঁটি আঁটি ধান নিয়ে চলে। হেমন্ত লক্ষ্মী যেন মমতাময়ী জননীর কল্যাণী বিগ্রহ হয়ে ওঠে । হেমন্তে তেমন পুষ্প বাহার নেই, তবে আছে ফসলের প্রাচুর্য্য । হেমন্তে ধরার আঁচল ভরে ওঠে সোনা ধানের প্রাচুর্য্যে । হেমন্তের হিম ঘাসের উপর ঝরে পড়ে কামিনী । ঝরা কামিনীর মতো প্রিয়াহীন কবির হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে । তাই হেমন্তের হিম পথ ধরে কবি প্রিয়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন ।

'ঝরাপালক'এর কয়েকটি কবিতায় হেমন্ত ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । কবি জীবনানন্দ হেমন্তের অসাধারণ চিত্রকল্প রচনা করেছেন এই কাব্যে । তাঁর কবিমন উড়ে গেছে --- "হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে / বক বধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে ।"[৪]-- (কবি /ঝরাপালক) হেমন্ত প্রকৃতির নানা দৃশ্যের মধ্যে কবি তাঁর মানসীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন । যে মানসীকে কবি কোনদিন পূর্ণভাবে পাননি । সেই মানসীর প্রিয়া সত্ত্বাকে ঘাসের বুকে শিশিরের সঙ্গে মিশে, করবী কুঁড়ির পানে চেয়ে চেয়ে, কখনো হেমন্তের মাঠে ঝরে পড়া হিমের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন । হেমন্তের বিশেষ ফুল মাধবীর রূপের বর্ণনা রয়েছে 'শ্মশান' কবিতায়। যেখানে কবি লিখেছেন --- "কুহেলীর হিম শয্যা অপসারী ধীরে / রূপময়ী তন্বী মাধবীরে / ধরণী বরিয়া লয় বারে বারে ।"[৫]-- (শ্মশান / ঝরাপালক)

শুধু ধরণী নয়, কবি জীবনানন্দও হেমন্ত ঋতুকে কবিতায় বারবার গ্রহণ করেছেন । একরকম প্রকৃতির কাছে যেন জীবনানন্দের কবি মন বাঁধা পড়ে গেছে । তিনি ঋতুর রঙকে জীবনের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তে । এখানে তিনি ঋতু চিত্রনে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন । প্রিয়াকে অন্বেষণ করতে গিয়ে কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, যেদিন তিনি হেমন্তের মতো পৃথিবী থেকে ঝরে পড়বেন শীতরূপী মৃত্যুর কোলে -- তখন কি কবির প্রিয়া তাঁর সঙ্গী হবেন ? "হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন -- / পথের পাতার মতো তুমিও তখন / আমার বুকের পরে শুয়ে রবে ? / অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন / সেদিন তোমার ?"[১]

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৮৩
২. অম্বুজ বসু ঃ একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণি ঃ কলকাতা ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১১ / পৃষ্ঠা ১০৮
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১২৪
৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২৬
৫. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৩৬

'মাঠের গল্প' কবিতাতে 'মেঠোচাঁদ', 'পেঁচা', 'পঁচিশ বছর পরে', 'কার্তিক মাঠের চাঁদ' কবিতাংশগুলি রয়েছে। এই অংশগুলিতে প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন Uncanny । অনেকটা ইয়েটসের 'Under the Moon' কবিতার 'Moon light'[২] এর মতো । মানুষ ও মেঠো চাঁদ উভয়েই বিচ্ছিন্ন, একাকী ও নিঃসঙ্গ । জমি থেকে মানুষ ফসল কেটে নেওয়ার পর জমিতে তৈরী হয়েছে ভয়াবহ শূন্যতা । যে শূন্যতা থেকে তৈরী হয় পোড়ো জমি । এলিয়টের 'The Waste Land'[৩] এর মতো । বারবার ফসল উৎপাদনের আক্রমনে পৃথিবী ক্রমাগত হয়ে গেছে বুড়ি । 'মাঠের গল্প' কবিতায় জীবনানন্দ সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি পৃথিবীর মলিন চেহারা অঙ্কন করেছেন। কার্ত্তিক কিংবা অঘ্রাণের রাতের আকাশে কবি চাঁদ-তারা এসব ছবির পাশাপাশি দেখেছেন বাঁশপাতা-মরাঘাস-ধোঁয়াটে - কুয়াশা ও ঘুমন্ত পৃথিবীর ছবি । কবি জীবনানন্দ 'পঁচিশ বছর পরে' কবি তাই দেখালেন -- সৌন্দর্য্যের দু একটি ধবংসাত্মক ছবি । 'চড়ুইয়ের ভাঙা বাসা' পথের উপর পাখির ডিমের খোলস, নষ্ট শসা, শুকনো মাকড়সার ছেঁড়া জাল ইত্যাদি। কবি, শেষবারের মতো কবিতায় দেখিয়েছেন আকাশের বুক থেকে মেঘ সরে গেছে । নক্ষত্র আবার ফুটে উঠেছে । পর মুহূর্তে আবার দেখিয়েছেন কার্তিকের মাঠের শিয়রে চাঁদ উঠেছে । জীবনের স্বাদ নিয়ে চাষারা আবার ফসল উৎপাদনে মেতে উঠেছে ।

'অনেক আকাশ' কবিতায় শীতের সময়ের ও হেমন্তের সময়ের নদীর প্রবাহের প্রাণোচ্ছ্বলতা দেখিয়েছেন। হেমন্তের নদী কবির আকাঙ্খার ও আলোড়নের প্রতীক । শীতের নদী কবি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি শূন্যতার প্রতীক । আসলে কবি জীবনানন্দ হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এ কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর প্রতীকীতে দেখেছেন । একই পৃথিবীতে হেমন্তে ও শীতে তিনি সৌন্দর্য্যের অবসান হতে দেখেছেন ।

কার্ত্তিকের ভোরে ক্ষেতের উপর রোদ এসে পড়েছে। হেমন্তকালে দেখেছেন রূপশালী ধানের মাতৃত্বের পরিণতি । দেখেছেন গর্ভবতী ধান্যনারীর সৌন্দর্য্য । এমন দৃশ্য দেখে কবির মনে হয়েছে, হেমন্তের ধানকে গর্ভে ধারণ করে পৃথিবী দুপা ছড়িয়ে বসে আছে । উপমা প্রিয় কবি জীবনানন্দের পক্ষেই কেবল এমন বর্ণনা সম্ভব । তাঁর হাতেই হেমন্ত ঋতু শরীরী অবসাদ ও ক্লান্তি নিয়েও অপরূপ মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে । তিনি 'অবসরের গান' কবিতায় পাড়া গাঁর কার্ত্তিকের মাঠের মিঠেল রোদের নরম উৎসবের আমদের কথা বর্ণনা করেছেন । ফলন্ত ধানের রঙে, গন্ধে, স্বাদে ভরে গেছে সকলের দেহ ও মন । সমস্ত উৎসব মুখর পরিবেশের অন্তিমে কবি গেয়েছেন অবসরের গান -।

"হেমন্তে বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর
বিছানার পর
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ মাঠের মাটির ভিতর ।
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা শব হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল !"[৪] -- (অবসরের গান / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রেমকে অন্বেষণ করতে গিয়ে হেমন্ত ঋতুকে উপযুক্ত সময় হিসেবে কবি নির্বাচন করেছেন। তিনি বুঝেছেন, জীবনের অসহ্য আঘাতে মৃত্যুর মতো প্রেমও চলে যেতে পারে। কবি বলেছেন, সূর্য, নক্ষত্রের চেয়ে প্রেম শক্তিশালী, স্বনির্ভর । অঘ্রাণের রাতে কিংবা কার্তিকের শীতেও প্রেমের কাছে মৃত্যু ভয় তুচ্ছ হয়ে যায় । রহস্যময় প্রেমকে সহজে ধরা যায় না । তাই কবি বলেন -- 'আমরা ধরেছি ছায়া- প্রেমেরে তো পারিনি ধরিতে।'[১] অতি তুচ্ছ কারণেই প্রেম ছিন্ন হয়ে যায়, হারিয়ে যায় । এই প্রেমের অন্বেষণেই প্রেম প্রার্থীরা ঋতুকাল ধরে প্রেমাভিসার করে । "প্রথম প্রণয়ী সে, যে কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে যেতে / থেমে গেছে সে আমার তরে !"[২]

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৫৫
২. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 39
৩. T. S. Eliot and his the Waste Land (A critical Study) / Student Store, Bareilly - 243001, Page - 12
৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা -৮১

বাংলাদেশ এক ঋতুরঙ্গশালা। এদেশের বুকে প্রত্যেক ঋতুই সুন্দর ও স্পষ্টরূপে বিরাজমান। 'রূপসী বাংলা'র কোন কোন কবিতায় হেমন্ত ঋতুর মুখচ্ছবির আড়ালে মৃত্যু চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি বলেছেন -- যখন গৌড় বাংলায় হেমন্তের আগমন হয় তখন নিসর্গ প্রকৃতি একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। যেমন- কার্তিকের অপরাহ্নে হিজল পাতা উঠানে ঝরে পড়ে। কঙ্কাবতী, শঙ্খমালা এসব রূপসীদের দেহের গন্ধ ক্রমে ম্লান হয়ে গেছে। অথবা এও দেখা যায় এদের সমাধির উপর জন্ম নিয়েছে অসংখ্য ঘাস। সেই ঘাসের উপরে নরম হলুদ পায়ে নেচে বেড়ায় বাংলার পরিচিত পাখি শালিখ। হেমন্তের প্রতি বিশেষ এক অনুরাগে কবি জীবনানন্দ কোন এক কার্তিকের নবান্নে, ভোরের কাক হয়ে জন্ম নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আবার এই হেমন্ত ঋতুতেই মৃত্যুর ইচ্ছা করেছেন -- 'যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্ত্তিকের নীল কুয়াশায় / যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে।'[৩] কার্ত্তিকের নীল কুয়াশা মৃত্যু ঘন পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়। রোমান্টিক কবিমনও মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে এমনই হৃদয়াকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন -- 'একদিন ছেড়ে যাব আম, জাম, বনে নীল বাংলার তীর'[৪]। তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে মৃত্যুদেবীর পদধ্বনির কথা শুনিয়েছেন পাঠকদের। কবি জীবনানন্দ মৃত্যুর উপলব্ধি করেছেন, পেঁচার কাছে ইঁদুরের মরণের ভিতর, নক্ষত্রের খসে পড়ার ভিতর।

যুদ্ধ বিধবস্ত পরিস্থিতিতে রূপসী বাংলার সৌন্দর্যময় রূপ কালিমাদীর্ন হয়েছে। কবির মনে হয়েছে যুদ্ধ বিদীর্ণ পৃথিবীতে কোথাও যেন সুন্দরের জায়গা নেই। এমনকি তাঁর কাছে প্রিয়াও তখন অনুপস্থিত। তবে মনে করেন তাঁর প্রিয়ার শরীরী রূপ ছড়িয়ে পড়েছে সর্ষে ক্ষেতের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে, ধান্য শীষের মধ্যে। তাই তিনি অঘ্রাণে যে ধান ঝরে পড়েছে, তারই দু এক গুচ্ছ হাতে তুলে নিয়েছেন। ধানের স্পর্শে প্রিয়ার উপস্থিতি অনুভব করেছেন। নিঃসঙ্গ কবি অকপটে বলেছেন, --'জানি সে আমার কাছে আছে আজো - আজো সে আমার কাছে আছে'[৫] বাংলার নির্জন অঘ্রাণে। তাই প্রান্তরের পথে পথে ছড়িয়ে থাকা পল্লীর মনোমোহিনী রূপের সৌন্দর্য পাণ করতে চেয়েছেন।

'কারুবাসনা' উপন্যাসে কবি জীবনানন্দ লিখেছেন কিশোর বেলায় বনলতা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই বনলতার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রান্ত করেছে নায়ক। আর কবি জীবনানন্দ বলেছেন, যখন ধান পাকার কার্ত্তিক মাস এসে উপস্থিত হতো, তখন কবির নিঃসঙ্গ মনে বনলতার স্মৃতি ধরা দিত। "আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি ! / আবার বছর কুড়ি পরে -- / হয়ত ধানের ছড়ার পাশে / কার্ত্তিকের মাসে .... / মাঠের ভিতরে !"[৬] -- (কুড়ি বছর পরে / বনলতা সেন)

-- 'শঙ্খমালা' কবিতায় হারিয়ে ফেলা বনলতা, রূপকথার রূপসী হয়ে উঠেছে। তাঁর স্মৃতি কবির মনে অঘ্রাণের অন্ধকারে ভেসে উঠেছে। 'ধান সিঁড়ি নদীর তীরে' এই দৃশ্য কবির হৃদয়কে প্রেমে দলিত মথিত করেছে। মোট কথা এই যে, হেমন্ত ঋতুর আগমনে কবির পুরনো স্মৃতি জেগে উঠে। প্রেমে বিবশ কবি মন হৈমন্তিক বিষণ্ণতার দিনে অনুভব করেছেন -- "অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;/ সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে / হেমন্ত এসেছে তবু,"[১]

'কুড়ি বছর পরে' কবিতার নায়ক কার্তিকের ধান ক্ষেতে নায়িকাকে ফিরে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। 'দুজন' কবিতায় হেমন্তের মাঠে নায়ক প্রেমকে ফিরে পেতে চেয়েছেন। যুদ্ধ ধবংস পৃথিবীর

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১০২
২. তদেব; পৃষ্ঠা - ১০৭
৩. তদেব; পৃষ্ঠা - ১২৬
৪. তদেব; পৃষ্ঠা - ১২৬
৫. তদেব; পৃষ্ঠা - ১৩২
৬. তদেব; পৃষ্ঠা - ১৫৩

মানুষ ব্যথিত হয়ে পড়েছে । প্রেম-স্বপ্ন- সফলতা - শান্তি নেই মানুষের মনে । প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে আর হাতছানি দেয় না । কিন্তু কবির মনে সিন্ধু সারসের গীত ধবনি প্রেমিকের মনে অতীত স্মৃতি জাগিয়ে তোলে - 'পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ / পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই ।"[২] যুদ্ধ সন্ত্রস্ত পরিস্থিতিকে কবি তুলে ধরেছেন 'সাতটি তারার তিমির' সংকলনের মধ্যে । তিনি যুদ্ধের পটভূমিতে প্রস্তর যুগের ঐতিহাসিক নিওলিথ স্তব্ধতার স্পর্শ অনুভব করেছেন । কাল বিপর্যয়ের মধ্যেও কার্তিকের জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে প্রান্তর, সে প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে মহীনের ঘোড়াগুলো । ঋতু পরিক্রমায় পৃথিবীতে হেমন্ত ঋতু এসেছে । সমকালীন পরিস্থিতির মধ্যে জীবনানন্দ হেমন্তের ঐতিহাসিক দৃশ্যের পুর্নজাগরণ দেখেছেন । তাই তিনি বলেন, -- "আমরা যাই নি মরে আজও -- তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয় : / মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে !"[৩]-- (ঘোড়া / সাতটি তারার তিমির)

-- 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে লেখা কবিতাগুলির চিত্রকল্প নির্মানেও কবি হেমন্ত ঋতুর ব্যবহার করেছেন।

"সেখানে উচু উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল - রাঙা -
চুপে চুপে ডুবে যায় জ্যোৎস্নায় ।"[৪]

হেমন্ত ঋতুর বিচিত্র বর্ণনা ও ব্যঞ্জনা জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম লক্ষণ । পাখি, প্রাণী ও কীট পতঙ্গের সঙ্গে হেমন্ত ঋতুর সমাবেশ বিশ্ব কবিতার ইতিহাসে বিরল, যা জীবনানন্দের কাব্যে রয়েছে । হেমন্ত ঋতুর অনির্বচনীয় বর্ণনা পাঠকদের মুগ্ধ করে । 'চারিদিকে উঁচু উঁচু উলু বন, ঘাসের বিছানা;/ অনেক সময় ধরে চুপ থেকে হেমন্তের জল / প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে সময়ে নীলকাশ বলে / সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল / মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে / অথবা ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে;"[৫] -- (হাঁস / সাতটি তারার তিমির)।

কবি দেখেছেন লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে নারীর উপস্থিতি, হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহর, ভোরের নদীর নির্মল জল এবং চির উজ্জ্বল সূর্যের আলোক পরম বিশ্বাসের । তিনি আরো বলেছেন, সৎ সংকল্প ও সফলতার একমাত্র উপযুক্ত সময় এই হেমন্ত ঋতু। 'তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক ! /হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলো "[৬]-- (তিমির হননের গান)। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের মানুষের মধ্যে রয়েছে সংশয়ের সুর । তন্দ্রাহারা মানুষেরা সঠিক ঠিকানা দেখতে পায় না -- 'হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোন তারা নেই'[১] (রাত্রির কোরাস)। মনে হয়েছে 'ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রি করোজ্জ্বল'[২]-- (সূর্যতামসী)।

'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ে এসে কবি অনুভব করেছেন প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ব্যবধান রয়েছে । কবির হৃদয় সত্ত্বা পৃথক -- 'আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান/মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকাল বেলায়;/ এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে / কেটে গেছে; তবুও আবার কেটে যায় ।"[৩] -- (সামান্য মানুষ / বেলা অবেলা কালবেলা)। হেমন্ত ঋতুর ইন্দ্রিয়ঘন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায় । কবি জানিয়েছেন হেমন্তের স্তব্ধতায় কবির

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৭৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৭
৫. জীবনানন্দ দাশ ঃ জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ / বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৮৬ / পৃষ্ঠা ১৩
৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২৩১

হৃদয় অবরুদ্ধ হয়ে গেছে । অতীতের হেমন্তের দিনগুলিতে মানব হৃদয় উজ্জ্বল ও রঙে ভরপুর হয়ে উঠত। কমলা হলুদ রঙের আলো - আকাশ - নদী - নগরী পৃথিবীকে রঙিন করতো । এখন মানব হৃদয় হেমন্তের হিম আঁধারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে । কিন্তু কবির বিশ্বাস এমন একদিন আসবে, যখন নতুন অমল পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে আলোকময় ভোর ।

'প্রয়ান পটভূমি'তে দাঁড়িয়ে কবি আশা করেছেন, একদিন হেমন্তের আঁধারে হিম অতিক্রান্ত হবে, আসবে আলোকময় ভোর । আবার অঘ্রাণের রাতে কবি দেখেছেন, আমলকি পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়। পৃথিবীর তীরে রয়েছে কত ধূসর বাড়ীর চিত্র । শীতের অন্ধকার সরিয়ে হেমন্ত লক্ষ্মীর আগমন ঘটেছে । "জীবনের হৈমন্ত সৈকতে' এসে মৃত্যুমুখী মানুষ আলো ও কর্মের জয়গান গাইছে । 'জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানব হৃদয়', 'কেবলই কল্লোল আলো', 'উনিশশো অনন্তের জয় হয়ে যেতে পারে' -- (হেমন্ত রাতে) -- এমনই ভাবনা প্রকাশ করেছেন কবি জীবনানন্দ । 'ইতিহাসযান' কবিতায় হেমন্তের রোদ, দিন, অন্ধকারের মধ্যে তিনি অতীত পিতৃপুরুষদের স্মৃতিচারণ করেছেন । হেমন্তের অপরাহ্নে তিনি দেখেছেন অদৃশ্য সূর্যের উজ্জ্বল আলো । আত্মঘাতী মানুষ হেমন্তের রাত্রি, নক্ষত্রপূর্ণ আকাশে, প্রেম-শান্তি- সত্যের আলোর নিশানা দেখতে পেয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি পরম বিশ্বস্ততা কবি অনুভব করেছেন । মনে করেছেন ইতিহাস খোঁড়া রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে ঝর্ণার জলোচ্ছ্বাস একদিন পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে । মহানীলাকাশে উঠবে রৌদ্রের কোলাহল । সৃষ্টির বঞ্চ না ক্ষমা করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবনানন্দ এমনই গভীর বিশ্বাস নিয়ে সপ্রতিভভাবে হেমন্তের দিকে চেয়ে আছেন ।

জীবনানন্দের সাহিত্যের মূলে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেদনা ও চেতনার জাগরণ । পাখির অপমৃত্যু, প্রকৃতির ধূসর রূপ, হারানো প্রেম, -- এসব সকরুণ অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে । 'ঝরাপালক' এই নামকরণটির পেছনে যে করুণ দৃশ্য ফুটে উঠেছে তা হল, আদি কবি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ যুগলের একটির হন্তারক বিষাদের নৃশংসতা । এই দৃশ্যের ঘটনায় শোকাতুর জীবনানন্দও । 'রামায়ণ' এর কাব্যের বীজ রয়েছে এই সকরুণ নামকরণের ভাবটির মধ্যে। এই ছবি শুধু 'ঝরাপালক' নামকরণে নয়, তার বিভিন্ন কবিতা ধারায় বয়ে চলেছেও। 'নীলিমা' কবিতায় 'চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধির - লিপিকা', 'চাঁদিনী' তে বলেছেন, -- 'হয়তো সেদিনও মাণিকজোড়ের মরা পাখিটির ঠিকানা মেগে / অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছটফট দুটি ডানার বেগে'।[৪] বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর 'সারদামঙ্গ ল' এ, রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি' প্রতিভাতে, জীবনানন্দ ও তাঁর সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে জীবন খেলার নিয়ম ভাঙা ঐ শিকারের গল্পটিকে তুলে ধরেছেন । জীবনানন্দের কবিতায় শিকারীর গুলির আঘাত এড়িয়ে বুনোহাঁস দিগন্তের জ্যোৎস্নার ভিতর মিলিয়ে যায় । 'সিন্ধুসারস' এর বুকেও দুঃসাহস নিয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা রয়েছে। এসব সকরুণ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্দিষ্ট ঋতুর অনুষঙ্গ । নরম ননীর মতো পাখা, ঘাড়ভাঙা, মুখে রক্ত মাঙা শেফালির বোঁটার মতো ফোঁটা ফোঁটা লাল আধপোয়া রক্তের মতো কল্পচিত্র। জীবনানন্দের চেতনার সংকলনগুলিতেই কেবলমাত্র পাঠকের চোখে পড়ে । এসব অপমৃত্যুর দৃশ্যকে কবি আরও সংবেদনশীল করে তুলতে ঋতুর উপমা ব্যবহার করেন।

জীবনানন্দের কবিতার মূলে রয়েছে জীবন ও মরণ -- পরস্পর সম্পর্কিত দুই প্রসঙ্গ । তিনি দেখেছেন যে আশ্রয় পুনরুজ্জীবনের, সে আশ্রয় আবার অঙ্গারে অশ্রুসিক্ত । অঙ্গারের সঙ্গে ছাই রয়েছে । তাই

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২৩৪
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩৩
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২৬১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪

যেখানে বাসনা ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই কখনো কখনো ফুটে উঠেছে মৃত্যু চেতনা -- ‘অনন্ত অঙ্গার দিয়া হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি গড়ি’[১] -- (আলেয়া) -- এসব কথা ভেবেছেন জীবনানন্দ । মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী সৌধ পিরামিডের কথা, আগুনের মতো তেঁতে ওঠা বালি রাশির কথা, জ্বলন্ত চিতার কথা, শ্মশানবন্ধুদের কথা তখনই ভাবছেন, যখন বাসনার সঙ্গে ব্যর্থতা এসে জীবনকে অতৃপ্ত করে তুলেছে । প্রকৃতির বর্ণাঢ্যময় পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ করে মৃত্যু চেতনা ফুটে ওঠা এসব ভাবনা আরব্য উপন্যাসের ইন্দ্রিয় ঘন কাহিনীর মধ্যে নিহিত রয়েছে । ‘আলেয়া চাঁদনী রাতে ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল’-- এসবের মধ্যে যুক্ত হয়েছে আরব্য উপন্যাসের বিচিত্র ও বর্ণাঢ্যময় কহিনী। যা দিয়ে তিনি কবিতা গড়ে তুলেছেন।

‘ঝরাপালক’এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে জীবনানন্দ ক্লান্তিহীনভাবে জীবনের পরিণতি পার হয়ে অন্য কোনখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেছেন । রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’তে এই সুর শোনা গেছে । ‘হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোন খানে’[২] । ‘ধূসরপাণ্ডুলিপি’র কবিতাগুলি স্পর্শকাতর ও অধিক সংবেদনশীল। সেখানে বেদনার ভার অপার । অকৃতার্থতা, অচরিতার্থতার মধ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন তিনি। সেখানে শিল্প সৃষ্টির কথনে তিনি বলেন, আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য আগুনের দহন প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’[৩] । ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে কবি জীবনানন্দ পাণ্ডুর লিখনের চেয়ে রূপকথার গল্প ও গানের প্রসঙ্গ বেশি করে উল্লেখ করেছেন । যেমন ‘ঝরাপালক’এ ঝরাপালকের চেয়ে কবি বেশি করে এনেছেন ঝরা পাতার প্রসঙ্গ । ঝরা পাতার সূত্র ধরে বেশি পরিমাণে হেমন্ত ঋতু বিরাজ করেছে । ঝরাপাতা, ঝরাপালক -- এসব মৃত্যু চেতনায় হেমন্ত ঋতু বারবার ফিরে এসেছে । জীবনের জয়গান লিখতে গিয়ে জীবনতৃষ্ণা বা জীবন পিপাসা কথকের মুখে প্রায়ই এসেছে । তাই ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ‘নির্জন স্বাক্ষর’ কবিতায় কবি ভালোবাসার গান লিখতে গিয়ে ঝরাপাতার সঙ্গে পুঁথির পাতাকেও পথে স্থান দিয়েছেন । সমালোচক জীবনানন্দের এসব চিন্তা ভাবনার প্রসঙ্গে বলেছেন --

> “পাতা ঝরার ঋতুর প্রসঙ্গ, কেবলই ঝরে পড়ে পাতা উড়ে উড়ে যাওয়ার অনুষঙ্গ, জীবনানন্দের ধূসর পাণ্ডুলিপিতে অবিরল, এবং তার পরেকার কবিতার বইগুলোয় দুর্লক্ষ্য নয় । উড়ন্ত হলুদ পাতা আর খোলা পাণ্ডুলিপির হলুদ পৃষ্ঠা কবির নিশ্চেতনায় একাকার ।”[৪]

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ধূসরতা শিল্পীত কবিতার পাশাপাশি রয়েছে নিসর্গ জগতের বর্ণের সমারোহ । প্রকৃতির রঙের সঙ্গে মিশেছে জীবনানন্দের মনের মতো রঙ । ‘প্রেমের স্পর্শে’, ‘নির্জন স্বাক্ষর’ কবিতায় জীবনের রঙ ফুটে উঠেছে। সবুজ ঘাস, নীল আকাশ, সমুদ্রের জল, রাত্রিচারী পথিকের দেশ-কালের পটভূমিতে নারীর প্রেম অন্বেষণ জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ কাব্য ভাবনাতে এসব ফুটে উঠেছে । প্রেমাবেগের অনুরাগে কবি সজোরে বলতে পেরেছেন -- ‘পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন’।[১]-- (বনলতা সেন)। জীবনানন্দ যে ধূসরতাকে মানব সত্তায়, প্রকৃতির মাঝে অনুভব করেছেন, সেই ধূসরতাময় চিন্তাভাবনা কবির পাণ্ডুলিপির রঙে ধূসর হয়ে উঠেছে। কবির দৃষ্টি পড়েছে, ‘অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি’র উপর (নগ্ন নির্জন হাত) । আবার তিনি শান্ত গম্ভীর, বিষন্ন সুরে অনুভব করেছেন -- “এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর / ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্খার ঘর ।”[২]

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা - ২০
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৮৫
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৮১
৪. বীতশোক ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ /বাণীশিল্প, কলিকাতা ৬ / প্রথম প্রকাশ, ২০০০ / পৃষ্ঠা ৪২

জীবনানন্দ দেখেছেন নিসর্গ প্রকৃতির ছবি মানব প্রকৃতিকে পূর্ণ করে তোলে । সন্ধ্যের সময় শালিখ পাখি উড়ছে, হিজল বনের ভিতর ঘুঘু পাখি ডাকছে । সবুজ ঘাসের উপর আর আলো নেই । মাথার উপর শুধু আকাশ ছড়িয়ে আছে। এমন সুন্দর পরিবেশে রোমান্টিক কবিমন ভালোবাসার চোখ নিয়ে দেখেছেন দৃশ্যের পর দৃশ্য । গ্রামের মেঠো পথে ধীরে ধীরে গরুর গাড়ী চলছে, সোনালী খড়ের গাদা গ্রামের বাড়ীর আঙ্গিনায় রয়েছে, আর দুজন মানুষ - মানুষী ভালোবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে । চারিদিকে মৃদু নীরবতা, সোনালী খড়ের স্তূপ, 'পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে'[৩] হেমন্ত ঋতুর এসব অনুভব কবিতায় রূপায়িত করেছেন । শালিক পাখি খড় কুটো মুখে তুলে নীড়ের দিকে উড়ে চলেছে, মানুষ মাঠের খড় তুলে তুলে আঙিনায় ঠাঁই করে চলেছে — জীবনানন্দ এখানে যেন পূর্ববাংলার বরিশালের প্রকৃতিকে অঙ্কন করেছেন । তাঁর হাতে চলমান হেমন্ত ঋতুর প্রকৃতি রোমান্টিকতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে । স্নিগ্ধ মেঠো পরিবেশে কবির প্রেমিক ও শিল্পী মন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে । সমালোচক বলেছেন ---

> "হেমকান্তি হেমন্তের মন্থরতার এই কবিতা । ধীরে ধীরে সব পরিপূর্ণ -- সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে । শালিখ যেতে আছে, গোরুর গাড়ী যেতে আছে, আঙিনা ভরে আছে, ঘুঘু ডাকতে আছে, রূপ লেগে আছে ঘাসে, প্রেম জেগে আছে দুজনার মনে । আছে আছে আছে, সবকিছুর মধ্যে ফলে উঠছে এক চিরস্থায়ী ইতিবাচকতার স্বাদ ।"[৪]

বিশ্বযুদ্ধ, কলকাতার নাগরিক সভ্যতার চাপের মধ্যে বসে কবি রূপসী বাংলার অপরূপ দৃশ্য দেখেছেন । কবি যখন মাঠে মাঠে ফিরে বেড়ান, তখন ভুলে যান বাংলার জীবনের সংকটময় পরিস্থিতির কথা । মৃত্যু ছায়াঘন পরিবেশের কথা যখনই কবির স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে, তখনই তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃতির বিষণ্ণ চিত্রের কথা -- 'কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় ।'[৫] কবি এই বিষণ্ণ চরিত্র ও সংকটময় পরিবেশে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বাংলার মুখ দেখতে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ মাধুরীকে বাংলার প্রতিচ্ছবির মধ্যে খুঁজে পেতে চান । বাংলা যেন বিষণ্ণ, করুণ আর্তির মধ্যে আটকে পড়েছে । 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলির উপর প্রকৃতি, মৃত্যু ও স্মৃতির ছায়া ঝুঁকে পড়েছে। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া সংকটময় দুর্দিনে কবি প্রকৃতির মধ্যে জেগে ঘরে ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। জীবনানন্দের উপন্যাসে ও গল্পে নায়ক চরিত্রগুলির মধ্যে এই মনোবাঞ্ছা প্রকাশ পেয়েছে । 'বাসনার দেশ' গল্পে কথক তথা জীবনানন্দ বলেছেন, —

> "পাড়াগাঁ কুয়াশার ভিতর পেঁচার ওড়াওড়ি, অনেক মৃত্যু ও আগুন এবং সেই নারী যে কলকাতার পথে মোটর ব্যবহার করে, দিল্লী ও মুসৌরিতে যার অবাধ গতি, বিলেত পর্যন্ত চলে যায়, সেই সব নারী, আবছায়া আমার জীবনে এই সমস্তই মিশে রয়েছে, প্রথমটাই বেশি, দ্বিতীয়টা খুব কম, আবহাওয়াটা প্রতিবিম্বের আস্বাদের মতো ।................ কিন্তু তবুও এক - আধদিন সন্ধ্যার দিকে সময় পাই আমি। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াই । রাত্রিরে বই নিয়ে বসি কিংবা বইয়ের মতো দু-একটি

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৫৩

২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৮

৪. বীতশোক ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ /বাণীশিল্প, কলিকাতা ৬ / প্রথম প্রকাশ, ২০০০ / পৃষ্ঠা ৯৯

৫. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা - ১২৬

স্বপ্নকে। আমার মনে হয় আমার জীবনে স্বপ্নও হচ্ছে এখন একটা গভীর উদ্যম -- স্বপ্ন ও মনন । কার্তিকের বিকেলে আমাকে একটা নিঃসঙ্গ শালিখ করে দাও । হিম অন্ধকার রাতে কার্তিকের -- আমার নীড় ভিজিয়ে দাও শিশির জলে, সেই শালিখের হৃদয়ের ভিতর আমাকে মানুষের মনন ও স্বপ্ন দাও । সমস্ত আকাশের চিরন্তর নক্ষত্রেরা আমার অনুভবকে আরো গভীর আরো গভীর পরিধি দিতে থাকুক ।”[১]

— (বাসনার দেশ)

প্রাকৃতিক ছায়ার অনুষঙ্গে মৃত্যু আর স্মৃতির ছায়া এসে পড়েছে ফণীমনসার ঝোপে, শটিবনে । ইয়েটসের কবিতাতে যেমন রুক্ষ, ক্লান্ত, ক্ষুধিত, মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে, তেমনি জীবনানন্দের কিছু কবিতায়ও তাই ঘটেছে শ্যামার সুমধুর নরম সুরের পাশে ছিন্ন খঞ্জনার রূপকে বেহুলার বেদনা বিদ্ধ নাচের সঙ্গে তুলে ধরেছেন । লক্ষীন্দরের জীবনকে ছিনিয়ে আনতে বেহুলার সঙ্গে প্রকৃতিও শোকাকুলা হয়ে উঠেছে । জীবনানন্দের বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি ঘুঙুরের কান্না হয়ে বেজে বেজে উঠে । কোথাও বা জীবনানন্দ কিশোরীর ভালোবাসার স্পর্শ পেতে ঘুঙুরের আয়োজন করে । -- ‘হয়তো বা হাঁস হব -- কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায় ।’[২]

‘আকাশলীনা’, ‘বিভিন্ন কোরাস’ এই দুটি কবিতা এবং ‘সুতীর্থ’ উপন্যাসে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী রয়েছে। কবি জীবনানন্দ তাঁর প্রেমিকা ও নারীর প্রেমকে নিয়ে ‘আকাশলীনা’ কবিতা লিখেছেন । এই কবিতার মাঠ, মাটির ঘাস, বাতাস, আকাশ, নক্ষত্রের রূপালিতে আগুন ভরা রাত যে বিশেষ সময়ের জানান দিয়েছে তা হল একটি নির্দিষ্ট ঋতু । এ ঋতু জীবনানন্দের প্রিয় ঋতু । জীবনানন্দের প্রেমিক মন যখন নারীর ভালোবাসার মধুরতায় ভরপুর হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই তাদের মাঝে অনিবার্যভাবে এক তৃতীয় পুরুষের ছায়া এসে পড়ে । তাতে প্রেমিক জীবনানন্দও যন্ত্রনাকাতর হয়ে পড়েন । অসহায়ভাবে জীবনানন্দ তখন উচ্চারন করেন -- “একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে / তবুও আতঙ্কে হিম -- হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে / আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল / ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে; / কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই -- পথ নেই বলে / যথা স্থান থেকে খসে তবুও সকলি যথাস্থানে / রয়ে যায়;শতাব্দীর শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম / নেমে আসে ।’[৩] --- (বিভিন্ন কোরাস)

মেঘের প্রসঙ্গ সেই কালিদাসের কাব্য থেকে সাহিত্যধারায় আজও বহমান । জীবনানন্দের ভাবনায় নির্মিত ভিজে মেঘ এসেছে । কখনও ‘মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে’[১] -- (মৃত্যুর আগে /ধূসর পাণ্ডুলিপি) । ‘মেঘদূত কাব্যে’র সে অলকাপুরী জীবনানন্দের কবিতায় ধানসিঁড়ি নদীর মানচিত্রে রূপ নিয়েছে । জীবনানন্দ স্মৃতিআতুর নিসর্গ নিবিড় গ্রামীন । বাংলাদেশের ধান সিঁড়ি নদীর পাশে তিনি প্রেমিক বিরহী কল্প চরিত্রের রূপক চিলকে উড়িয়ে এনেছেন । ভিজে, সজল মেঘের প্রেম স্মৃতি ভরা মিলনের সুমধুর পরিবেশ থাকলেও প্রেমিকার অনুপস্থিতিতে তৈরি হয়েছে ব্যথাময় শূন্যতার ছায়া । বর্ষার পটভূমিতে লেখা ‘হায়চিল’ কবিতা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, --

“কালিদাসের শ্লোকটিতে মেঘকে বলা হচ্ছে যে, নদীর সঙ্গে মিলিত

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্প সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৭৭৭

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১২৬

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ২২০

হয়ে তুমি 'ভব রসাভ্যন্তরঃ' অর্থাৎ অন্তরে রসপূর্ণ হও । কালিদাসের রসপূর্ণ মেঘ আর জীবনানন্দের এই ভিজে মেঘ এক শ্লিষ্ট অর্থ বহন করে চলেছে । দুটি ক্ষেত্রেই এর অর্থ ঃ জলে ভরে ওঠো, নদীর সঙ্গে সঙ্গমজনিত তৃপ্তিতে ভরে ওঠো । .... 'হায়চিল' যে দুপুরবেলাকার মেঘ সে যেন ছায়াময় আবহাওয়ায় ধানসিঁড়ি নামের ভরানদীতে সদ্য উপগত হয়ে এই উঠে এল । সে ভিজে, সজল ও পরিতৃপ্ত । ভেজা মেঘের নদীর সঙ্গে মিলনের আনন্দের এ পরিবেশে -- স্ত্রী পুরুষের মথিত সহবাসের আনন্দের এই পটভূমিতে একা একা চিলপুরুষ আর একাএকা পুরুষ কথকের বেদনার ভূমিকা গাঢ়তর রেখায় অঙ্কিত মনে হতে পারে।"[২]

'হায়চিল' কবিতায় মেঘ হল উদ্দীপন বিভাব, নারী হল আলম্বন বিভাব এবং অনুভাব হয়েছে ভীরুতা । রাঙা রাজকন্যা, মেঘলা দুপুর, চিলের ডাক -- এসব অনুষঙ্গ বাঙালীর বিরহ চেতনায় নিবিড় হয়ে আসা বর্ষাকাল মনে হলেও এ ঋতু শীতঋতুর দুপুরও হতে পারে । বর্ষার চিল পাখি, শীতের দুপুর, বসন্তের কোকিল, শীত রাত্রে জীবনানন্দের কবিতায় উপস্থিত থেকেছে । শুধু 'হায়চিল' কবিতায় নয় 'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতায় তিনি বর্ষার দুপুরে নয়, মাঘের দুপুরে মেঘকে জমতে দেখেছেন ।

"ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর - চিল একা নদীটির পাশে
কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে ।"[৩] (ভিজে হয়ে আসে মেঘে)

বাংলাদেশের ধানসিড়ি বেতবনের পাশে হারিয়ে যাওয়া রাঙা বউর জন্য কাতরতা তৈরি হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায় । সেই রাঙা নারীর সন্ধানে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির মেঘলোকে চিল উড়ে চলেছে । জীবনানন্দ বাংলার ত্রস্ত দুঃসময়ে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম, হারানো প্রেমকে খুঁজেছেন । 'হায়চিল' কবিতায় জীবনানন্দ যেমন রাজকন্যার স্মৃতি ভাসিয়ে তুলেছেন, অনেক উপন্যাসেও এই বিরহী প্রেমিকদের দেখা মেলে। জীবনানন্দের কবিতায় রাজপুত্র গ্রাম্য কিশোর এবং রাজকন্যা গ্রামীন কিশোরী । সেই রাজপুত্রের রাজকন্যা নেই, এমনকি পাড়াগাঁর সেই কিশোর কিশোরীরা মৃত । কবি অথবা কথক হয়ে জীবনানন্দ ক্ষণিকের প্রেমকে শাশ্বত এবং শিল্পীত প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন । 'প্রেতনীর রূপকথা' উপন্যাসে, 'বিভা' উপন্যাসে চলেছে নায়কদের প্রেমাভিসার, তা আবার অত্যন্ত গোপনে । জীবনানন্দের 'মাল্যবান' উপন্যাসে নায়ক মাল্যবান বাংলাদেশের প্রকৃতি থেকে নারী প্রকৃতি এবং নাগরিকা স্ত্রীর সান্নিধ্যে নৈসর্গিক আস্বাদ লাভ করতে চেয়েছেন । হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোর সফলতায় কবি প্রেমের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন । এ কবিতার চিল তরুণ যুবক । কারণ চিলের ডানা সোনালি রয়েছে, খয়েরি হয়ে প্রৌঢ় হয়ে ওঠেনি এখনও।

জীবনানন্দের কিছু কবিতায় রয়েছে তারাভরা আকাশের পটভূমি । যদিও চিমনির কালো ধোঁয়ায় আকাশকে দেখা যায় না, তবুও এ আকাশ অন্ধকারে হয় নক্ষত্রকীর্ণ । সূর্য হল দিনের নক্ষত্র । রোদে - জ্যোৎস্নায় - সবসময়েই তাই জীবনানন্দ নক্ষত্রের উপস্থিতি দেখেছেন । কবি জীবনানন্দ এও বলেছেন, নক্ষত্রের দিকে তাকালে প্রান্তরের দিকেও একবার তাকাতে হয় । নক্ষত্র-সূর্য-আকাশ-প্রান্তর- ঘাস- গাছ-জলের নিসর্গচিত্র যে কবিতায় উপস্থিত, সেখানেতো যেকোন ঋতুও বিরাজ করে চলেছে । ওপরের আকাশ,

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা - ১১২
২. বীতশোক ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ /বাণীশিল্প, কলিকাতা ৬ / প্রথম প্রকাশ, ২০০০ / পৃষ্ঠা - ১৩০
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা - ১৩০

নীলিমা, সঙ্গে রোদের ভিতরে, উঁচু উঁচু গাছ - এসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে শান্তি আছে। অবক্ষয়ে, রক্তস্রোতে, যান্ত্রিকতার মধ্যেও শান্তি আছে । সেখানে প্রেম, শিল্প নক্ষত্রের অভিমুখে যাত্রা করে, সিঁড়ির অনেক নীচে থাকে গ্লানি, ক্ষয়, কালিমা । 'উত্তর সামরিকী' কবিতার শেষ স্তবকে ঋতুর অনুষঙ্গে কবি জীবনানন্দ সিঁড়ির কল্পচিত্র নির্মান করেছেন ।---

'শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ জীবনের পরিচিত সত্ত্ব শূন্য কথা ---
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্বর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা; ....'[১] -- (উত্তর সামরিকী)

জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়ক মাল্যবান মাতৃহারা। পরিণত মানুষ হয়েও তার অসুস্থতার শিয়রে মমতা বিমুখ স্ত্রীকে সে মায়ের মতো পেতে চেয়েছে । স্ত্রীকে সে মায়ের অব্যক্ত ইঙ্গিত মনে করে শান্তি পেতে চেয়েছে । অনুভবে পেতে চেয়েছে মায়ের মত শুশ্রূষা। কথাশিল্পী জীবনানন্দ বলেছেন ----

"যে মা হয়েছে, মাল্যবান বললে, 'সে মানুষের শিয়রে না এসে পারে না, তুমি মনুর মা বটে আমার স্ত্রী । কিন্তু সময়ের কোন শেষ নেই তো । সেই সময়ের ভেতর আমাদের বাস;সময়ের হাত এসে এ - জিনিসটা মুছে দেয় -- সেখানে সে জিনিসটা জাগিয়ে দেয়; মানুষের স্ত্রী তুমি; নিজেওতো মানুষের মা, মানুষ; সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহতার ভেতর তোমার মা রূপ ফুটে উঠল তো; দেখছি । সময়ের দু একটা ঘূর্ণিকে কেমন অবিরাম গ্রন্থির বলয়ে নিয়ে এসে গড়ে তুললে, দেখছি তো । এই তো নীচে নেমে এলে হাড় - কালিয়ে শীতের রাতে, সিঁড়ি বেয়ে। না এলেও তো পারতে । আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশাও করিনি যে তুমি আসবে । কিন্তু তবু তো এলে ---"[২]

গোটা 'বিভা' উপন্যাসটিই শীত ঋতুর প্রেক্ষাপটে লেখা। এ উপন্যাসে শীত ঋতু শুধু প্রকৃতির বুকে বিরাজিত নয়, মানবমনেও বিরাজিত। শীতের গঙ্গাসাগরের মেলাতে দেখেছে মৃত এক মেয়েকে। যে মেয়ের মুখকে নায়ক খুঁজে পেয়েছে 'বিভা'র মধ্যে। নারী প্রেমের অপ্রাপ্তির বেদনায় এ উপন্যাসের প্রেমিকরা শীতার্ত হয়ে পড়েছে। বিভাকে কেন্দ্র করে প্রেমিক পুরুষেরা প্রেমের অপ্রাপ্তিতে গোপন যন্ত্রনা বহন করেছে। প্রেম-স্বপ্ন-সৌন্দর্য বিভাকে ঘিরে বিকশিত হয়ে উঠলেও এ উপন্যাসের প্রেমিকদের কাছে নারীর চেয়ে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনিয়ন্ত্রিত স্রোতের ধারা বেশি সজীব হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসের সকল প্রেমিক পুরুষদের কাঙ্ক্ষিত নারী বিভা। যে সবার কাছেই অপ্রাপনীয়া হয়ে থেকে গেছে। সেই বিভার মতে বড় প্রেমিক হল সেই ব্যক্তি যে লালসার জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরও প্রেমের চিরন্তনতার উপর কোনদিন বিশ্বাস হারায়নি। প্রেম কোন শৌখিন খেলার বিষয় নয়, প্রেম হল পূজার জিনিস।

প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এখানে জীবনের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। জীবন অপরাজেয়। চারিদিককার

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ২৭০
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৮২৪

নিষ্ফলতা ও বেদনার ভিতর থেকে জীবনকে জয় করতে হয়। সমস্ত হতাশা ও অন্ধকার ভেদ করে আশার স্বপ্ন দেখতে হয়, যেমন করে গঙ্গাফড়িং সমুদ্রকে জয় করার জন্য যাত্রা করে। শীতে বিভা পাখির কষ্টকে বড় করে দেখেছে, নিবারণ করা চেষ্টা করেছে। বিভার এসব আবেগ আবদার প্রাধান্য দিয়েছে যেসব পুরুষেরা তারা শুধু বিভাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই করেছে। পৌষ মাঘের ঠাণ্ডায়, আকাশভরা রোদে, কখনো শীতের দুপুরে ডালমুট ইত্যাদি সুস্বাদু খাওয়ার, বিভার স্বাস্থ্যকে অটুট রাখার নানা চেষ্টা — এসব প্রচেষ্টা শুধু বিভাকে পাওয়ার তাগিদেই। পুরুষের হৃদয়ের শীত, এই শীতকে অতিক্রম করতে পারেনি এ উপন্যাসের প্রেমিকরা। তাই শেষ পর্যন্ত বিভা অপ্রাপনীয়া নারী হয়ে থেকে গেছে, বিভার প্রেম অধরা থেকেছে উপন্যাসের সব প্রেমিকদের কাছে।

'পূর্ণিমা' উপন্যাসের নায়ক সন্তোষ অর্থক্লেশে পীড়িত এক যুবক। সে নিজ স্ত্রী পূর্ণিমার প্রতি উপযুক্ত দায়িত্ব - কর্তব্য পালনে অক্ষম হাওয়ায় স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। অথচ পূর্ণিমা সবচেয়ে রূপসী ও সতেজ এক মহিলা। পূর্ণিমা সন্তোষের কাছে শুধু অর্থের অভাব পায় নি, সন্তোষের হৃদয়ের ভালোবাসাও অর্জন করতে পারেনি কোনদিন। জীবনানন্দের জীবন ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলা যায় এ উপন্যাসের নায়ক যেন জীবনানন্দের জীবনেরই প্রতিরূপ। এ উপন্যাসের নায়ক বুঝেছে, সন্তোষ বুঝেছে বিপুল তামাশাবোধ ও মর্মান্তিকতাই তার জীবনের অরিহার্য বিষয়। পূর্ণিমাকে জীবনসঙ্গী করেও মর্মান্তিকতাই তার জীবনের অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পূর্ণিমাকে জীবনসঙ্গী করেও সন্তোষের জীবন নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। শীতের অন্ধকার রাত তার কাছে কঠিনরূপ পরিগ্রহণ করেছে। এমন অসহায় উপায়হীন জীবনকে সন্তোষ হেমন্তের পাতার মত ঝরিয়ে দিতে চেয়েছে। স্ত্রীর রূপ ও মোহ সন্তোষের লালসার খাদ্য হয়ে উঠতে পারে নি কোন দিনও। তা বলে সন্তোষ প্রেমকে হারায় নি। পূর্ণিমার প্রসবের, মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে সন্তোষ। অথচ সন্তোষ এও বুঝেছে যে, পৃথিবীতে কাউকেই ভালোবাসেনি সন্তোষ, পূর্ণিমাকেই শুধু ভালোবেসেছে, পূর্ণিমাকে পেয়েই একমাত্র তার জীবনের মানে পরিবর্তীত হতে পারে। স্ত্রীর প্রতি অনুকম্পায়, শীত রাতের কঠিনতায় সন্তোষের নিঃসঙ্গ রুধিরাক্ত জীবন উপায়হীনভাবে সন্তোষ নিজের জীবন থেকে পূর্ণিমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেয়েছে।

অসুস্থ মৃণাল দীর্ঘদিন প্রকৃতির বুকে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেনি। রূপবতী, যৌবনবতী হওয়া সত্ত্বেও মৃণাল রোগগ্রস্ত হওয়ায় অকালেই মৃত্যুমুখী হয়ে পড়েছে। প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয় নিতান্তই শারীরিক অক্ষমতার কারণে প্রেম-শূন্য হয়ে উঠেছে। আনন্দ বিলাসিতার বদলে পেয়েছে ব্যথা। সে পৃথিবীর প্রেমিক পুরুষদের কাছ থেকে প্রেমের বদলে পেয়েছে দয়া। নিজের অসহায় অবস্থাকে অনুভব করে মৃণালের মনে পড়েছে - বাসাভাঙা পাখির দুর্দশার মতো। যখন মৃণাল পাড়াগাঁয় ছিল, কার্ত্তিক-অঘ্রাণের সন্ধ্যায় পাখির ভাঙা বাসা দেখতো তখন, কষ্ট পেত নিরাশ্রয় পাখির বেদনাহত, অসহায় জীবনের কথা ভেবে। বাংলাদেশের প্রকৃতিকে ভালোবেসে মৃণাল এখানেই মৃত্যু কামনা করেছে। বাংলার নারকেল গাছ, বুড়ো অশ্বত্থ, শালিখ-চড়াই-কাক এদের দেখে মৃণাল তৃপ্তি পায়। রোগজীর্ণ, শীর্ণ মৃণাল তার নিজের চেহারাকে মিলিয়েছে প্রকৃতির বুকে মাত্র তিন মাসের শীতে প্রায় খসে পড়া সব পাতার অশ্বত্থ গাছটার সঙ্গে। সে ভাবে ফাল্গুন-চৈত্রের ভিতরে অশ্বত্থ গাছের আবার নতুন কিশলয় তৈরি হবে, রূপ ফিরে আসবে, ঝাঁকড়া হবে। কিন্তু মৃণাল ধীরে ধীরে আরও রোগজীর্ণ হয়ে, প্রেমহীন জীবন নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। মৃণাল বুঝতে পেরেছে নিখিল আসে মৃণালের জন্য নয়, আমলার জন্য। শরীরের কুশ্রীতার জন্যই মৃণাল নিখিলের কাছ থেকে প্রেম বঞ্চি তা হয়েছে। শরীর সংলগ্ন প্রেমের কথা বলেছেন জীবনানন্দ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত মৃণাল ভাবে যদি তার দেহের জন্য নয়, যদি মনের জন্য কোন প্রেমিক পুরুষ আসে, তাহলে তার জীবনটা

সার্থক হতো। রোগশীর্ণ শরীরকে ন্যাড়া শিমুলগাছ এবং হৃদয়ে জাগ্রত প্রেমকে লাল ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে মৃণাল। ফাল্গুনের পড়ন্ত রোদে মৃণাল ভেবেছে, পৃথিবী চিরকাল সুন্দর থাকবে, নীল আকাশ থাকবে, নক্ষত্র থাকবে, ভোর থাকবে, রোদ থাকবে, আর থাকবে মৃণালের জীবনের গভীর স্পৃহা ও বিচিত্র আনন্দ। মৃত্যুর আগে রোগ অবসন্ন জীবনে মৃণাল তার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে হৃদয়াকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছে আন্তরিকতায় ঐকান্তিকতায়, —

" 'ভেবেছিলাম বিয়ে করব, মানুষের মনে একটি সন্তান রেখে যাব।' ....
কিন্তু পৃথিবীতে কত মানুষ দাম্পত্য জীবন চালিয়ে কত শান্তি পাচ্ছে,
কত মানুষের কত সুন্দর শিশু হয়েছে, ভেবে নিলেই হল, আমি সেই
বধূ, সেই সব শিশু আমারই।"[১]

মৃণালের জীবনে যে ছায়া নেমে এসেছে, সন্ধ্যা নেমে এসেছে, তা সে কিছুতেই গ্রাহ্য করতে চায়না। বরং রোদটুকুকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়, বিচিত্র জীবনকে নিবিড় স্পৃহায় ভোগ করতে চায়। কিন্তু মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতিতে মৃণালের আশা অপূর্ণই থেকে যায়।

জীবনানন্দ 'মৃণাল' ও 'নিরুপম যাত্রা' দুটি উপন্যাসে অনিবার্য ও অকাল মৃত্যুর কাহিনী লিখেছেন। দুই উপন্যাসেই জীবনাকাঙ্ক্ষার গভীর ইচ্ছাকে তুলনা করেছেন প্রকৃতির দৃশ্যপট দিয়ে। শিমুলের ডালপালার পাতা নেই, অথচ অসংখ্য লাল ফুলের নিশানা রয়েছে। এ উপন্যাসের নায়কের জীবনে স্ত্রী-শিশু পুত্র জীবনকে পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারে নি, শুধু আর্থিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানির জন্য। লেখক জীবনানন্দ নায়কের জীবন চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুর, ধান শূন্য ক্ষেত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কাশ, খড়ের স্তূপ- এসবের সঙ্গে তুলনা করেছন। অর্থের প্রয়োজনে প্রভাত গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। সেখানে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলেও প্রভাত গ্রামের কথা ভুলতে পারে নি। গ্রামে ফিরে আসার কথা ভাবে, এমনই ভাবে, ফাল্গুন, কার্ত্তিক, চৈত্র মাস অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু প্রভাতের আর যাওয়া হয়ে উঠেনা। স্ত্রী কমলা, শিশুপুত্র কেতু এদের জন্য বুকের ভিতরে শূন্যতা নিয়ে প্রবাসী শহরে মারা গেল প্রভাত, নিরুপম যাত্রা করলো। কেউ তার অসুখের খবর জানল না।

ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ 'কারুবাসনা' উপন্যাসটির লাইন শুরু করেছেন এরকম, আষাঢ় শেষ এরকম 'আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল'[২]। শ্রাবণে গুঁড়ি গুঁড়ি অঝোর ধারা মনকে রোমান্টিক করে তোলে। সংসারের অভাব, স্ত্রী কল্যাণী, কন্যা খুকুর প্রতি উদাসীন ভাব থাকলেও এ উপন্যাসের নায়কের মধ্যে পূর্ব প্রেমের অব্যক্ত বেদনা কিংবা প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। হেম বইগুলিকে বড্ড ভালোবাসে, অথচ বর্ষায়, উইয়ের অত্যাচারে বইকে ক্ষতি হতে দেখেও অন্য এক মেজাজের বশে এগুলো তার কাছে সতেজ ও পরিহাসপ্রিয় বলে মনে হয়। কখনো হেম খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে, বাইরে বিকেলের আলোয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে, কখনো শরতে, কখনো হেমন্তে দেখছে প্রকৃতির নানা দৃশ্য। শালিখ ঘাসে ঘাসে পোকা খুঁটে খায়, ফড়িং উড়ে, পাতা খসে পড়ে, দাঁড়কাকের দল উড়ে যায়, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ যায় ছেয়ে - এমন কত অপূর্ব দৃশ্য দেখে যায় হেম। এই হেম চরিত্রকে দেখে মনে হয়, এ আসলে কবি জীবনানন্দই। —

"কার্ত্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ১৯২
২. তদেব, পৃষ্ঠা ২১১

ঝরে পড়ে, পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় হাঁস,
আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি — শালিখ নিয়েছে নিঙড়ায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস;এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে — কাঁচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে — "[১]

প্রেম, প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে জীবনানন্দ যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন তার সম্পর্কে জীবনানন্দের নিজস্ব অভিমত এই, — "সকালের সমাজ বা সময়ের মানুষ, বিভিন্ন পদ্ধতির উৎসায়নে প্রেম, বা এখনকার প্রকৃতি, অথবা আজকের সমস্যা, যে কোনো জিনিসকেই কবিতা তার নিজের শরীরে গ্রহণ করে তার এমন কয়েকটি সম্ভাবনায় তাকে এত স্পষ্ট করে দেখে যে বুঝতে পারা যায় নিজ স্বভাবে যে ব্যাপারটি রয়েছে তাকে যতদূর সম্ভব তার স্বরূপে - প্রতিবিম্বের আশ্রয়ে ততটা নয় — চেনা গেল।"[২] বর্ষার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে হেম। জীবনানন্দের চাকরিবিহীন, বিবাহিত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে এ উপন্যাসে। হেম রূপী জীবনানন্দ বলেন — "প্রায় একমাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি।"[৩] লাবণ্যের সঙ্গে বিয়ে করার পর যে তিনি আর দিল্লির চাকরিতে ফিরে যান নি, অথচ কলকাতায় কিছু একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়ার কথা রোজ ভাবতেন - এ উক্তি যেন উপন্যাসের এই লাইনের সঙ্গে মিলে গেছে। শুধু আর্থিক জীবনে নয়, তিনি হেমন্তের প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসতেন তারও প্রচুর উদাহরণ এ উপন্যাসের প্রকৃতি বর্ণনায় প্রমাণ মিলেছে। স্ত্রী কল্যাণী পাশাপাশি রয়েছে, অথচ হেমের অনুভবে - "হেমন্তের বিকেলে নিস্তব্ধ ম্লানতার ভিতর একটা রুগ্ন হাঁসের মত শুকনো পাতার উড়াউড়ির মধ্যে হংসগামিনী গতিতে একা একা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে।"[৪]

হেম সংসারী, তবু তার মনে হয় জীবন শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ নয়। তাঁর মন সংসারের বেড়াজাল ভেদ করে হেমন্তের সন্ধ্যায়, বিকেলের ধূসরতার ভিতর হেম সবুজ ঘাসের মাঠের পথে হাঁটতে থাকে। বটের নীচে উপকথার পথিকের মতো দাঁড়ায়। অতীত, ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতাকে খুঁজে ফেরে। সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো - অন্ধকারের পথে চলার এক অন্য অনুভূতিকে খুঁজে চলে হেম। আজকের সংসারের ক্ষয়-ক্ষতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন অথচ জীবনের আর এক অংশ কিশোর বেলার নষ্ট প্রেমকে ভুলতে পারেনি 'কারুবাসনা' উপন্যাসের নায়ক হেম। হেমের স্ত্রী কল্যাণীর প্রতি আগ্রহের পরিচয় দিতে চেয়েছে। কিন্তু হেমের চোখে কল্যাণীর রূপ প্রতিভাত হয়েছে এক অন্যরকম প্রতিকৃতি হয়ে। কল্যাণীর মধ্যে হেম দেখেছে, — "হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা;মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মত হিম, বেদনাতুর;মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মত বিহবল বিষণ্ণ চোখ।"[১] যেন এই বর্ণনায় জীবনানন্দ রংতুলি নিয়ে কল্যাণীর ছবি আঁকার প্রয়াস দেখিয়েছেন।

জীবনানন্দ তথা হেমের ভালোলাগার ভালোবাসার দেশ বাংলাদেশ। অর্থ অনটন ক্লিষ্ট হেম কল্পনা করে "ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব।"[২] যেখানে চারদিকে

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১২৩
২. জীবনানন্দ দাশ ঃ কবিতার কথা / সিগনেট প্রেস ঃ কলকাতা-২৩ / দশম সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৩ / পৃ. - ৬৬
৩. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২১১
৪. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২১২

বাবলাগাছের ঘনবেড়া দিয়ে ঘেরা থাকবে মাঠ। ঝুমকোলতা, লতাপাতার আলিঙ্গন হবে। পাশ দিয়ে বয়ে যাবে মেঘনা, ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কর্ণফুলী, ইছামতীর মত নদী। হেমন্তের বিকেলে শরতের রাতে, চোত - বোশেখের দুপুরে মাঠের মধ্যে থাকা অশ্বত্থগাছ, বাঁশের জঙ্গল, আম-কাঁঠালের, বেতের বন, কাশ, কালসোনা ঘাসের উপর উড়ে বেড়াবে ফড়িং, প্রজাপতি। এসব সুন্দর দৃশ্যগুলি হেম তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে বলে আশা করে। হেম চরিত্রটি শ্রাবণ মাসের আকাশ ভরে অজস্র মেঘের মধ্যে এসব কল্পনা করেছে। কারুতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারেনি হেম, বরং বরাবর সংসারের প্রতি উদাসীন থেকেছে। সমস্ত কবিতা ও শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা যেন হেমের জীবন থেকে বাতাসে উড়ে গেছে। সংসারের ছককাটা উন্নতিকেও পরিপূর্ণতা দান করতে পারে নি হেম। তবুও প্রকৃতির বুকে বৃষ্টি শুরু হয় যখন, তখন হেমের বেশ লাগে। খড়ের উপর বৃষ্টির সম্‌সম্‌ শব্দ, ধুলোমাটির নরম সোঁদা গন্ধ, শীত, কেয়া-কদমের সুগন্ধ হেমের হৃদয়কে শিহরিত করে তোলে। মৌসুমীর কাজলঢালা দিনে হেমের অবচেতনে জেগে ওঠে কিশোর বেলার কালোমেয়ের কথা। যে মেয়েকে হেম কোন এক বসন্তের ভোরে ভালোবেসে ফেলেছিল। কৈশোর আজ অতিক্রান্ত হয়েছে হেমের জীবনে, বিশ বছর আগের প্রেমও হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। কিন্তু শ্রাবণের ঘনধারায় হেমের রোমান্টিক প্রেম আবার ফিরে এসেছে। হেমের কথায় —

"বহু দিন যাকে হারিয়েছি — আজ, সেই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশে সেই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণামণি, পূর্ব আকাশে আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কালো মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কালো দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার - প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিবারণ দু-খানা হাত ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। সেই বনলতা — আমাদের পাশের বড়িতে থাকত সে। কুড়ি - বাইশ বছরের আগের আগের সে এক পৃথিবীতে।"[৩]

জীবনানন্দের 'কারুবাসনা' একটি আত্মজীবনী ধরণের উপন্যাস বলা যেতে পেরে। এই উপন্যাসের বনলতা কবির কল্পনারী, না কবির পরিচিত তা নিয়ে সমালোচকেরা অনেক অভিমত প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসে, কবিতায় এই নারীর নামের ব্যবহার নিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন, — "কারুবাসনার বিবৃতি আর "A rural girl beloved who might flavour my life with love : Y wakes that but Y is far from that."

অথবা, অন্যত্র ঃ

> "Y : What of her? ... No letter nathing ... I can Imagine her in I romantic setting : kissing and kind - would be life & death to me even two years back : but now!"

এই বলা কথাগুলি কি 'কারুবাসনা' উপন্যাসের থেকে, তার বয়ানের থেকে সত্যিই পৃথক? 'ব্যক্তি' বনলতার এই সম্ভাব্য পরিপ্রেক্ষিত এবং রহস্যকে মাথায় রেখেই আমরা কবির বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' কে

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২১৫

২. তদেবপৃ. - ২১৭

৩. তদেবপৃ. - ২৩০

বুঝে নিতে চাইব। সেখানে কে বনলতা সেন’ নয়, ‘কি বনলতা সেন’ অর্থাৎ কোথায় তার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে।”[১] উপন্যাসের বনলতাকে হেম পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। হেমের পাশের বাড়িতে থাকতো বনলতা একসময়। বনলতাদের চালের উপর প্রকৃতি প্রেমিক হেম দেখেছে, হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড় কাককে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলরব করতে। অন্যমনস্ক নত মুখে হেম ভেবে যায় কিশোর কালের হারানো প্রেমের কথা। বাইরের ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির পরিবেশে হেমের স্মৃতিতে ধরা দিয়েছে সেই নারী —

> “অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল, মনপবনের নৌকায় চড়ে
> নীলাম্বরী শাড়ী পরে চিকন চুল ঝাড়তে ঝাড়তে আবার সে এসে
> দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট
> শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি,
> অন্ধকারে তার যাত্রা —।”[২]

অঝোর শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে জানলার পাশ দিয়ে হেমের মন চলে যায় কিশোবেলার দেখা বনলতার কাছে। মনে পড়ে “এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।”[৩] এমনি অনুভূতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা স্বাদ জেগে উঠেছে হেমরূপী জীবনানন্দের হৃদয়ে। তাই জীবনানন্দ কবিতায় স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, —

> “সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
> সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
> পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
> তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙের ঝিলমিল;
> সব পাখি ঘরে আসে — সবনদী - ফুরায় এ - জীবনের সব লেনদেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।”[৪] (বনলতা সেন)

ঝম্ঝম্ বৃষ্টির পরিবেশে হেমের শুধু বনলতার কথা মনে ভেসে ওঠেনি, দেখা যায়, হেমের স্ত্রী কল্যাণীরও মনে পড়েছে নির্মলদার কথা। সংসার জীবনের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার পর হৃদয়ে অবারিত প্রেম জেগে ওঠেছে। কল্যাণীকে দেখে হেমের মনে হয়েছে বনলতাও হয়তো সমাজ-সংসারে আবদ্ধ হয়ে — “এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে? এমন কী? / আমি যদি যন্ত্রনায় বিছানা নি, সে যদি খবর পায়, এমনি করে সেও কী শিয়রের পাশে বসে থাকবার জন্য চলে আসবে?”[১] হেম তার নিজের জীবনের বেদনাকে বাদলের বাতাসে, শ্রাবণ-ভাদ্রের বৃষ্টি ও রোদের সঙ্গে মিশিয়ে অতিবাহিত করে। সে অনুভব করে — “বর্ষাকালে হাপুস চোখে কান্না আসে কিন্তু তবুও ফলের বাগান যখন তৈরি হয়ে ওঠে — বাংলার ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যা - সুখ, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি”[২]। তাই ‘কারুবাসনা’কে অনেক সমালোচক শুধু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে মনে করেন না, এটি জীবনানন্দের ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্ণালও বলা যেতে পেরে। কারণ এ উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কেও একটি তথ্যসূত্র

---

১. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার জীবনানন্দ / বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ঃ কলকাতা - ৯ / প্রথম প্রকাশ পুর্নমুদ্রণ, ১৪১৫ / পৃ. - ১৩
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২৩২
৩. তদেব ; পৃ. - ২৩৯
৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র; জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১৫৩

পাওয়া যায় যে —

"এই জানা কথাগুলোই নতুন করে জানতে ইচ্ছা করে আমাদের, বিশেষত একথা শুনে, কবিতা 'বনলতা সেন' রচিত হবার একবছর আগে লেখা, কিন্তু অপ্রকাশিত একটি উপন্যাসে বনলতা নামটি প্রথম পাওয়া গেছে। ১৯৩৩ সালে লেখা সেই নামহীন উপন্যাসের একটি পদ থেকে 'জীবনানন্দ সমগ্র' গল্পের সম্পাদক দেবেশ রায় লেখাটির নাম নির্বাচন করেন, 'কারুবাসনা'। 'কারুবাসনা'কে কবির ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্নাল ভেবে নেওয়াটাও সম্ভব ছিল, যেহেতু তার গঠন বিন্যাস অনেকটা তেমনই। উত্তম পুরুষে কথা বলা একজন সৃজনশীল মানুষের অভিজ্ঞতা আর আত্মকথাই আছে এখানে, আছে তার আবেগ এবং অস্মিতা।"[৩]

আর্থিক অভাব 'জীবন প্রণালী' উপন্যাসের নায়ক শচীনের স্বাভাবিক জীবনের স্বচ্ছন্দকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থের অভাব শচীনের সাংসারিক জীবনে, দাম্পত্য জীবনের উপর করাল ছায়া তৈরি করলেও প্রকৃতির অনুরাগের প্রতি কোনরকম বাধা তৈরি করতে পারেনি। শচীন তার স্ত্রী অঞ্জলিকে নিজের জীবনের বিধবস্ত অবস্থাকে তুলনা করেছে এরকম, অঘ্রাণ মাসের পরিত্যক্ত নীড়ের সঙ্গে। যে নীড়ের মধ্যে সজীবতা বা প্রানোচ্ছ্বলতা নেই। সে নীড় কতকগুলো খড়পাতার ছিবড়ে শুধু। সে নীড়ের ভিতর দিয়ে খুব সহজে হেমন্তের কুয়াশা আর শীতবাতাসের যাতায়াত ঘটে। এ উপন্যাসে শীত ঋতুকে বেদনা ও নিষ্ফলতার প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। এমন প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিতায় ও বারে বারে লক্ষ্য করা গেছে।

"তারপর — একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে —
পাতায় শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, - চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে, - পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা — কড়কড়।"[৪] (মাঠের গল্প/ ধূসরপাণ্ডুলিপি)

এ উপন্যাসে বৃষ্টির মায়াময় রূপের কথা যেমন রয়েছে, তেমনি বৃষ্টি শূন্য প্রকৃতির কথাও বলেছেন জীবনানন্দ। জামগাছের ঝুঁটি ধরে বাতাস চিড়্ চিড়্ করে, বক আনমনা হয়ে উড়ে যায়, ঝিঁঝির আওয়াজ করুণ অথচ অস্পষ্ট লাগে, আখখুটে ব্যাঙের চিৎকার, ঘরে ভিতর বাতাসে ভেসে বেড়ায় কয়েকটা জোনাকি। স্ত্রী অঞ্জলির প্রেমের মূর্তি হৃদয়ে নিয়ে কাটানোর ইচ্ছা নেই শচীনের। টাকার অভাবে তার জীবনটা বেদনায় ও জটিল হয়ে উঠেছে। এ সব সময়ে ঔপন্যাসিক তৈরি করেছেন বৃষ্টিহীন সময়। ঔপন্যাসিক নায়কের মনের অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এরকম — "দুপুরবেলা ঘুম আসছিল না— ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিজানি কেন কোনদিনও পারিনা। শ্রাবণের আকাশ, তবুও বৃষ্টি ছিল না, বেশ খটখটে রোদ — খানিকটা দূরে শুকনো অশ্বত্থের পাতা, কদমের কেশর আর বেলের কুঁড়িতে ঘাস রয়েছে ছেয়ে। অনেকদিন পরে ফড়িং আর প্রজাপতি নেমে পড়েছে;ঝি-ঝি প্রাণ খুলে ডাকছে;কয়েকটা শালিখ আর দাঁড়কাক — একটি আগন্তুক

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২৭১
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ২৮৫
৩. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার জীবনানন্দ / বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ঃ কলকাতা - ৯ / প্রথম প্রকাশ পুর্নমুদ্রণ, ১৪১৫ / পৃ. - ১২
৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৬০

বৌ কথা কও অশ্বত্থের নিবিড় ডালপালার ভিতর নিস্তব্ধ খুনসুড়ি করে ফিরছেঃ আবার যেন জৈষ্ঠ্যের দুপুর ফিরে এল"[১]। বাংলাদেশে থাকে শচীন। গরমের ছুটিতে তাদের অনেক বন্ধু দেশে আসে। দেশের পথে দেখা হয় অনেকের সঙ্গে। কোন বন্ধুই শচীনের আর্থিক দুরবস্থায় সাহায্য দিতে চায় না। শচীনের বাবা ঋণ, শ্রম করে অর্থ জোগাড় করে আজও পর্যন্ত। নারীর ভালোবাসা, নারীর রূপ নিয়ে জীবন কাটানোর কোনরকম অবকাশ থাকেনা শচীনের জীবনে। অর্থের হাহাকারই মূল হয়ে ওঠে। অঞ্জলি ভাবে — "একবার চাকরী পেলে তুমি আমাকে অনেক পরিপূর্ণতা দেবে, সে কি জানি না আমি?"[২] অঞ্জলিকে সে কিছুই কিনে দিতে পারেনি। প্রেম-অপ্রেম-যাইহোকনা কেন অঞ্জলিকে নিয়েই সে জীবন কাটাতে চেয়েছে। অর্থের প্রয়োজনে সে পরিচিত বন্ধুদের কাছে গেছে, কিন্তু সকলের দ্বারে দ্বারে সে শুধু পেয়েছে অপমান ও বঞ্চনা। শ্রাবণ রাতের প্রান্তরের ভিতর, ব্যাঙের মতন তৃষ্ণা ও আসক্তি নিয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছে। এ উপন্যাসে লেখক এমনই মানব হৃদয়ের অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন, —

> "কিন্তু তবুও শ্রাবণের কান্তারে প্রান্তরে পুকুরের পাড়ে, ধানক্ষেতে, উলুঘাসের ভিতর বর্ষার অবিরাম তীব্রতা ও বাদলের মর্মস্পর্শী কুয়াশার ভিতর ক্ষুধা ও খেদ, অধীরতা ও ব্যথা নিয়ে যে জীবন - যে জীবন পথের উপর আদিম যুগের চুম্বন রয়েছে, মধ্যযুগেরও, আধুনিক যুগেরও, সেই জীবনের পথে কোনোদিন চলি নি আমি, চলবার রুচি নেই আমার।"[৩]

বিপর্যস্তময় জীবনে নায়ক শীত অনুভব করে। সেই শীত অন্ধ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তি পাবে না মনে করে, আনন্দও পাবে না, জীবনের নতুন পথও খুঁজে পাবে না। কমললতাকে ভালোলাগতো একসময়, তারপর ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর কোন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় নি তার। আশ্বিন কিংবা কার্তিকের বিকেলের প্রসন্ন টানের মত নরনারীর জীবন, কিংবা চৈত্রের সন্ধ্যায় আঙিনার অপরাজিতার জঙ্গলের মধ্যে দুটো জোনাকির মত। তাদের চারিদিকে রয়েছে অন্ধকার ও শিশিরের শান্তি, শুধু নিরপরাধ শান্তি - এমনই জীবন। এর চেয়ে বেশি চাওয়া নেই বোধ হয় ঔপন্যাসিক জীবনানন্দেরও। তাই অঞ্জলিকে নিয়ে নায়ক তার জীবনটাকে বেঁধে নেওয়ার কথা ভাবে এভাবে — "চলো, কোনো একপ্রান্তরে চলে যাব আমরা —"[৪] অসহনীয় জীবন যন্ত্রনায় এ উপন্যাসের নায়ক বার বার শৈশবের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। যেন অনেক দূরের বাঁশের জঙ্গলের পিছন থেকে পঞ্চমীর জ্যোৎস্নায় মৃত মুখের স্মৃতি ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে। বাদলের শান্তির ভেতর ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে নায়কের। যখন ভাদ্রমাস, চারিদিকে শরতের নরম আভাস ছড়িয়ে পড়েছে, খালের কিনারে ঘাসের ভিতর নীল নীল ফুল ফুটেছে, ঘাসের ভিতর থেকে ফেনিয়ে উঠছে সুন্দর ঘ্রাণ, উলু খড়ের ওপারে মাছরাঙা হয়তো প্রিয়ার শূন্য বেদনার কান্না প্রকাশ করে চলেছে, বিকেলের শেষে পৃথিবীর ধান, সোনালি খড়, বাদামি খড়, প্রিয়ার ম্লানরূপ, অশ্বত্থ পাতার থেকে খসে পড়ার দৃশ্য মনে পড়েছে তখন। শচীন বন্ধু প্রতিমার কাছে দীনতা নিয়ে উপস্থিত হলেও, হৃদয়ের রাজ্যে প্রকৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে পরিপূর্ণ আজও, যা নষ্ট হয়ে গেছে প্রতিমার অর্থের বাহুল্যতার মধ্যে। রাজেন, শ্রীবিলাস, প্রতিমা প্রত্যেকের কাছেই শচীন পেয়েছে বঞ্চনা, কেউই তাকে আর্থিক বিপন্নতায় আপন করে নিতে পারে নি। অবহেলায়, প্রবঞ্চনায় শচীন অঞ্জলিকে নিয়ে তার জীবন প্রণালীকে সুপথে চালানোর কথা

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিতঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারাঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৩১২
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিতঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারাঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৩৩০
৩. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিতঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারাঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৩৪৮
৪. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিতঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারাঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৩৫১

ভাবে। শচীনের উক্তি - "ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নার পথের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। এরকম চিরকাল চলতে পারা যায় না কি? মাঠ-প্রান্তর ভেঙে, জানা-অজানার ওপারে, জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে বুনো হাঁসের মতন, যে-পর্যন্ত শেষগুলি এসে বুকের ভিতর না লাগে।"[১] এ-যেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি জীবনানন্দের কবিতার শিল্প-ভাষা। —

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্রনীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে; ....."[২]

আসলে জীবনানন্দের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই একই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। আবার জীবনানন্দের গদ্যের ভাব-ভাবনার সঙ্গে কবিতারও ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাই সমালোচক বলেছেন, - "তাহলে কি সৃজনী সংরাগের নিরিখে আখ্যান হতে পারে কবিতার সম্প্রসারণ, তার দ্বিরালাপিক শিল্পিত অপর?"[৩] শুধু তাই নয়, জীবনান্দীয় আখ্যানের ধরণটিই এরকম যে, একটি নায়ক চরিত্রের মর্ম অনুধাবন করলে প্রায় সমস্ত উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে এই নায়ক কি আসলে জীবনানন্দের ছদ্মবেশ, না লেখকের একটি মাত্র আখ্যানের খসড়া? — এ সম্পর্কে সমালোচক একটি তথ্য সূত্র দিয়েছেন এই যে, — "জীবনানন্দ কি একটিমাত্র আখ্যানের নানারকম খসড়া যখন প্রকট হয়ে উঠেছিল, সময় ও নিঃসময়ের কোনও বিশেষ দ্বিবাচনিক বিন্যাস তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল কি? আবার ১৯৪৮ সালে কেন তিনি ফিরে এলেন আখ্যানের কাছে? ইতিমধ্যে কবিতায় তো তিনি বাস্তব ও পরাবাস্তবের রহস্য নিবিড় গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ - মানুষীর সম্পর্ক ও নিঃসম্পর্কসহ মানবিক পরিসরের বিচিত্র সব সংরূপ নির্মাণ করেছেন। তবু বুঝিবা। জীবনের সমস্ত কৌনিকতা ব্যক্ত হয়নি। এই জন্যে তাঁকে পাশাপাশি লিখতে হলো 'প্রেতনীর রূপকথা', 'কারুবাসনা', 'জীবনপ্রণালী' ও 'কল্যাণী'র মতো প্রচ্ছন্নের আখ্যানের পাশাপাশি 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি', 'বাসমতীর উপাখ্যান' প্রভৃতি প্রতিবেদনও।"[৪]

মাল্যবান ও উৎপলার দাম্পত্যে যে পারাপারহীন শীতলতা ও অবসাদ রয়েছে, তার সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে 'মাল্যবান' উপন্যাসে। ছোটবেলায় মাল্যবান কোন কোনদিন শীতরাতে বাউলের গান শুনেছে। কিশোরকালে শুনেছে কোনো দূর হিজল বনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে আসা সুর। আবার কতদিন মাল্যবান ডাণ্ডাগুলি খেলে কাঁচা কাঁচা কালিজিরা, ধানশালি, রূপশালি ক্ষেতের আলপথ বেয়ে বাড়ি ফিরেছে, শুনেছে ভাটিয়ালি গান। কতদিন বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে কত রাত সে যাত্রা শুনতে গেছে। তারপর গানের সুর এমন পেয়ে বসেছে যে, পরীক্ষার পড়া মুখস্থের সঙ্গে গান গেয়েছে গুণগুণ করে। মাল্যবানের সেই অতীত দিনগুলোই যেন 'রূপসী বাংলা'র কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি জীবনানন্দ কবিতায় আক্ষেপ করেছেন এরকম ঃ

"— সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর —
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায় -

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা - ২৯২
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০5 / পৃষ্ঠা ১১২
৩. তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব/ অঞ্জলি পাবলিশার্স ঃ কলকাতা - ৯/ প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, এপ্রিল / পৃ. - ১৯৯
৪. তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব/ অঞ্জলি পাবলিশার্স ঃ কলকাতা - ৯/ প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, এপ্রিল / পৃ. - ১৯৮

যেদিন র'বেনা কোনো ক্ষোভ মনে — এই সোঁদা ঘাসের ধূলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায় — চারিদিকে বাঙালির ভিড়
বহু দিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি; ......"[১]

মাল্যবান ও উৎপলা বারো বছর বিবর্ণ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনের ফসল হয়ে এসেছে মেয়ে মনু। মা ও মেয়ে দোতলায় শোয়, মাল্যবানের ঠাঁই নেই সেখানে। হতাশ, অতৃপ্ত স্বামী মাল্যবান বারবার অপমানিত হয়েও নির্দয় বিমুখ স্ত্রী উৎপলার শরীরের আকাঙ্ক্ষা করেছে। বারবার ব্যর্থতার আর্তি নিয়ে প্রতিকারহীনভাবে অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছে। মাল্যবান শান্তি ভালোবাসে, ক্ষমা করে যাওয়া তার অন্যতম গুণ, নিজের সুখকে ছেড়ে দেয় সহজে। উৎপলা তাকে চূড়ান্ত হেনস্থা করলেও কোন প্রতিহিংসা নেওয়ার কথা ভাবতে পারে না মাল্যবান। স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ শারীরিক বিচ্ছিন্নতা দিয়ে জীবন কাটায় উৎপলা। অসহায় নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ মাল্যবান। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের শীতরাতের উদাসীনতার কথা তার মনে আসে। মাল্যবান পৌষের শীত রাতে তার বিবাহিত নারীর কাছে আকাঙ্ক্ষার নিভৃত তাড়নায় যায় এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসে। 'শীত' ঋতুর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা এ উপন্যাসের লেখনভঙ্গী সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, —

"এই 'অদ্ভুত নিরেট নিগ্রহময়তায়' সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনও সম্বোধন মানতা থাকে না; বরং সম্ভাব্য গ্রহীতা সত্তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অনুভব করে ঃ 'শীতের রাতের নিঃশব্দতা ও অতি-দীর্ঘতা, বেদীর্ঘতা, নিঃশব্দতা স্নিগ্ধতা হতে পারত।' মাল্যবান যে 'কনকনে ভিজে শীতে কেমন ন্যাতা জোবরার মত' হয়ে যায়, চিহ্নায়িত এই বাচন দাম্পত্যের বাস্তবকে উপলক্ষ্য করে অজ্ঞেয় অধিবাস্তবের দিকে ইশারা করে যেন। মাল্যবান ও উৎপলার বিচিত্র সংলাপের মধ্যে যে ঘুমের প্রসঙ্গ বারে বারে আসে, তা আসলে অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষাজনিত অবসাদেরই চিহ্নায়ক। উৎপলাকে মাল্যবান যেসব কথা বলে, বাস্তবে এমন সংলাপ হয় না। অর্থাৎ বাস্তব হয়েও তা বাস্তবায়িত কোনও প্রতীতির অবলম্বন ....।"[২]

জীবনানন্দের উন্মেষপর্বের প্রথম গ্রন্থ 'ঝরাপালক'। তাঁর প্রথম 'নীলিমা' কবিতা ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মতো । যুগ যুগ আগত অগনন মানুষের যন্ত্রনা কাতর পদযাত্রার সঙ্গে নীলিমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তিনি। ধরণীর লক্ষ বিধি বিধানের এই কারাতল যেন নীলিমারই আশ্চর্য যাদুদণ্ডে শাসিত। পৃথিবীর অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত, ছিন্ন বাস, নগ্ন শির ভিক্ষুকের দল, নিষ্করুণ রাজপথ, লক্ষকোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার ধরাতল, এই ধূলি ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার সমস্তই ডুবে গেছে নীলিমায় । নীলিমা ও পাতালের সীমাহীন ব্যাপ্তি এ কবিতায় ফুটে উঠেছে । 'পিরামিড' কবিতায়ও মহাবিশ্বলোকের ইশারায় নিখিল বিশ্বের প্রেক্ষাপট নির্ণীত হয়েছে । সেখানে পিরামিডকে ঘিরে 'শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে'[১]। অর্থাৎ অতীতের শোভাযাত্রা পেরিয়ে দিনরাত অতিক্রম করে প্রেমিক-প্রেমিকা, মানব-মানবী সব হারিয়ে গেছে । নির্বাক পিরামিড সে সবের অবিচল স্থান । যেন সে শব সাধনার মৌন নির্বেদী নিষ্ফল সন্ন্যাসী । মানুষের অনির্নীত যন্ত্রনা ও অশ্রুর বিচিত্র আলেখ্য হয়ে উঠেছে পিরামিড । তাই জীবনানন্দ জানিয়ে দেয় -

---

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১২৩
২. তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব/ অঞ্জলি পাবলিশার্স ঃ কলকাতা - ৯/ প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, এপ্রিল / পৃ. - ১৯৬

- 'মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা ঝরা / হেমন্তে স্বর বিদায় কুহেলী'[২]।

দূর আকাশের পটভূমির নিচে মৃত্তিকার জননী প্রতিম আবাল্য আহবান জীবনানন্দ শুনিয়েছেন -- 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতায়। এ কবিতায় তিনি ইম্প্রেসনিষ্টিক চিত্রকরদের দৃশ্যায়নকে রূপায়িত করেছেন। এ কবিতায় অগোছালোভাবে সজ্জিত হয়েছে নানা বিষয় -- জননী ও শিশুর বন্ধন, প্রেমিক ও প্রেমিকার ভালোবাসা, মৃত্তিকা ও আকাশের অসীমতা, নীলিমা ও বসুন্ধরার আত্মীয়তা, আর আলো-অন্ধকারের সংমিশ্রণ। কবি উতলা হয়েছেন, রোমাঞ্চিত হয়েছেন কত তিথিতে, এমনকি শরতের সৌন্দর্য্যেও ---

"কত তিথি, কত যে অতিথি,
কত শত যোনিচক্র স্মৃতি
করেছিল উতলা আমারে !
আধো আলো -- আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এল তারা ছুটে
মাটির বাঁটের চুমা শিহরি ওঠিল মোর ঠোঁটে -- রোমপুটে।
ধূ-ধূ মাঠ - ধানক্ষেত - কাশফুল - বুনোহাঁস - বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া !"[৩]

আবার কবি জীবনানন্দ গল্পের বুনুনি দিয়ে অতি পুরাতন কাহিনীকে আশ্চর্য দক্ষতায় নূতন ও চিরন্তন করে তুলেছেন। 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' -এ কবিতায় তিনি প্রকৃতির উপমা তুলে ধরেছেন। ডালিম ফুলের মতো গাল, রাঙা আপেলের মতো ঠোঁট, শাগুনের মেঘ, গোধূলি, হিম -- এসব শব্দ ব্যবহারে কবি যেন প্রকৃতিকেই ফলিয়ে তুলেছেন। কখনো কখনো তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদনশীল প্রকৃতি চেতনার ভিতর দিয়ে জীবনকে ছুঁয়ে যেতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এসব দৃশ্য দেখে বুঝেছিলেন, কবির অশান্তির তাড়না থেকে মহৎ কবিতার সৃষ্টি সম্ভব। জীবনের সমস্ত পূর্ব পটভূমি ও অভিজ্ঞতার উপর যেন এক নতুন নিরীক্ষাভূমি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। মানুষের বর্বর ধবংসলীলার হাতে নিপীড়িত হওয়ার ছবি দেখেছেন কবি জীবনানন্দ। 'ক্যাম্পে', 'পাখিরা', 'শকুন', 'মৃত্যুর আগে', 'স্বপ্নের হাতে', 'অবসরের গান' -- এসব কবিতায় তিনি অসহায় অবস্থার মাঝে জীবনের অন্বেষণ করেছেন। প্রকৃতিকে মানবের মতোই অনুভূতিপ্রবন করে তুলেছেন। চারিদিকে নুয়ে পড়া মাঠের ফসল এবং তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া শিশিরের জল কবিকে আপ্লুত করেছে। আবার রোদ যখন ঠোঁটে চুমু দিয়ে চলে যায়, ফলন্তের পরিপূর্ণতায় শরীর তখন আহ্লাদে অবশ হয়ে পড়ে।

নানা ঋতুর উল্লেখ বৈচিত্র্যে জীবনানন্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা ক্লান্তিহীন। যেমন তবে হেমন্ত ঋতু তাঁকে আপ্লুত করেছে সারা জীবন। নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। ঋতুর উপমা প্রয়োগে তিনি কখনো অবসন্ন হননি। ঋতুকে বিশেষ্য-বিশেষণ করে তুলেছেন তাঁর রচনায়। 'ঝরাপালকে' হেমন্ত ঋতুর উপস্থিতিতে তিনি বেরিয়ে পড়েন প্রিয়াকে অন্বেষণ করতে। তাছাড়া ফুটফুটে জ্যোৎস্না, হেমন্তের নরম উৎসব, নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার - এমনই ইন্দ্রিয় অনুভূতিশীল চিত্র নির্মান করেছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। বাংলার অপরূপ রূপ, শ্যামার নরম গান, খিন্ন খঞ্জনার মতো বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৪০
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৪০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৯

আকাশ 'রূপসী বাংলা'র প্রাণ সম্পদ। রূপ থেকে রূপান্তরে, ভাব থেকে ভাবান্তরে মানস পরিক্রমনের সেতু করেছেন ঋতুচক্রের পরিক্রমাকে। যেন তিনি ঋতুবৈচিত্র্যকে হাতের মুঠোয় করে সাহিত্য চর্চায় মনোনিয়োগ করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, —

> "তাঁকে .... হেমন্তের কবিই বলা চলে। যে বিষণ্ণতা তার মূলধন, যে স্তিমিত নিদ্রাচ্ছন্নতায় তিনি ভ্রান্ত বিলাসী, হেমন্তের আধ-আধ কুয়াশা এবং শ্রান্ত-প্রকৃতিই তার যোগ্য প্রতীক। শীত, বসন্ত, হেমন্ত, পাতার বিবর্ণতা, হলুদ খড় শুধু অনিবার্য অবসানের নয়, একটা কালের রিক্ততার চিত্রবহ হয়ে এল আমাদের কাছে।"[১]

মহাজিজ্ঞাসায় কবি জীবনানন্দ গ্রাম-বাংলা, বিশেষ করে বরিশাল - নোয়াখালির নদীমাতৃক জীবন, বাংলার পশুপাখি আকাশ প্রান্তর, ঋতুবৈচিত্র্য এবং শস্যময় প্রকৃতির চিত্র বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য চর্চায়। কখনো কখনো জীবনানন্দ ঋতুকে সঙ্গী করে নাটকীয় পরিবেশ রচনা করেছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন — "আবার বলছি কবিতাটির আরম্ভ বর্ণনাত্মক। (চারি পাশে বনের বিস্ময়, / চৈত্রের বাতাস, / জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন) এই প্রারম্ভিক বর্ণনা থেকে কবিতা নাটকীয়তায় মোড় নিয়েছে স্তবক শেষে (এইখানে নকটার্ণ —।) উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। এর পরে অন্তিম পর্বে কবিতা আত্মবেদী সংলাপের মধ্য দিয়ে গীতলতায় একাও হয়েছে"[২]। বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই।

জীবনানন্দ অনুভব করেছেন, পরিচিত প্রিয় এই বড় মায়াময় নিসর্গ জগৎ মৃত্যু শিহরিত। আকাশের নীলাভ বুক ছেড়ে ঝরে পড়ে নক্ষত্র, যে নক্ষত্র জীবনানন্দের সাহিত্য জগতে আলোক পথের দিশারী। এই মৃত্যু শিহরিত অনুভবকে জীবনানন্দ প্রকাশ করেছে হেমন্ত ঋতুর অনুষঙ্গে। 'রূপসীবাংলা'র মৃত্যুর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন —

"অন্যদিকে প্রকৃতি - পৃথিবীর আশ্রয়ী জগৎ থেকে কুয়াশায় ঝরে যায় রূপশালী ধান; আর এই হেমন্ত জীবনানন্দের কাব্যে সর্বদাই ক্ষয়ের ও বিলয়ের ভাবনা বহন করছে। কুয়াশায় ঝরে যাওয়া রূপশালী ধান অনিবার্য ভাবেই নিয়ে আসে ক্ষয়িষ্ণু নৈসর্গিক রূপৈশ্বর্যের কথা। এক পরিব্যাপ্ত মৃত্যু উৎকীর্ণ প্রকৃতির কোলে ক্ষয়িত কবিসত্তা উপলব্ধি করেন পরিত্রাণহীন মরণের টান।"[৩]

জীবন-মৃত্যুর শাশ্বত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ একটি কবিতা 'পাখিরা'। এখানে কবি হেমন্ত - শীত - বসন্ত - তিনঋতু পরিক্রমায় শেষ পর্যন্ত জীবনের জয়গান গেয়েছেন। শীতঋতু এখানে মৃত্যুর প্রতিভূ হয়ে দেখা দিলেও বসন্ত ঋতুর সমাবেশে জীবনের উষ্ণ ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়েছে নায়কের তথা পাখিদের জীবনে। প্রজননের তাড়নায় তুষার ঝড়ের শীতল মৃত্যু অতিক্রম করতে পেরেছে। ইন্দ্রিয় সংবেদনশীল নায়কের —

> "বসন্তের রাতে যখন চোখ ঘুমে জড়াতে চায়না স্কাইলাইট থেকে নেমে ভেসে আসে সমুদ্রের স্বর; কিন্তু সে সব ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে চারণ পাখিদের পারস্পরিক হার্দ্য আলাপ। কবির সংবেদনায় হানা দেয় অস্তিত্ব রক্ষার আদিম সংগ্রামের কাহিনী ছাপিয়ে অন্ধপ্রাণের ভালোবাসার

---

১. করুণাসিন্ধু দাস ঃ আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় কবি জীবনানন্দ/ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ - কলকাতা - ৭৩/ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০০/পৃ. - ৮১

২. প্রদ্যুম্ন মিত্র ঃ কবিতার গাঢ় এনামেলে;জীবনানন্দের কাব্য-ভাবনা/ দে'জ পাবলিশিং;কলকাতা - ৭৩ / প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০০ / পৃ. - ৭০

৩. প্রদ্যুম্ন মিত্র ঃ জীবনানন্দের চেতনাজগৎ / দে'জ পাবলিশিং কলকাতা - ৭৩ / দ্বিতীয় সংস্করণ;বৈশাখ, ১৪০৫/ পৃ. - ১৫২

উত্তরণের বাণী।" [১]

জীবনানন্দের সময়কালীন পৃথিবী জটিল ও দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছিল । তখন নিরাপদ ও নির্বিরোধে বাস করা ছিল কঠিন ব্যাপার । মৃত্যুর জড়তাকে দিয়ে গড়া সে সময়, যা দেখে কবির মনে হয়েছিল এ যেন পৃথিবীর ক্ষুধিত গহবর । সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বেঁচে থাকা, নক্ষত্রের রাতে পথ হাঁটা-যেন এক বিস্ময়ের। সেখানে প্রেমের সময়ের জেগে ওঠে মৃত্যুর ব্যথা অথবা ব্যথিত হয় অতীত । তবুও কবি অনেক ঘুমের ঘোর অতিক্রম করে জীবনকে অগাধ করে তুলেছেন । এজীবন পাখির মতো স্থির হয়ে নীড় বাঁধতে পারেনি । কারণ সময়টা ছিল দুঃসময়, অস্থির -- পাখির পাখা ছিল তীরবিদ্ধ । অধীর, অস্থির সময়ে মানুষ হেঁটেছে নক্ষত্রের আলোরেখা ধরে সমুদ্রের ঢেউয়ের জঙ্গমে । পৃথিবীতে মানুষ পথ হেঁটেছে ক্লান্তিহীন অবিরামভাবে, আকাশে অগাধ উৎসাহে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলোতে নষ্ট পৃথিবীর ছবি, ক্ষয় ও যন্ত্রনার শাশ্বত রূপায়ণ ঘটেছে । 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় শীতঋতুর পটভূমিতে দেখেছেন, ----

"জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছ -- তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পার তুমি;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছ, তবু ---
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝরে —
ক্লান্ত হয়ে -- শিশিরের মতো শব্দ করে ।" [২]

প্রেমের উষ্ণতা ও শীতের শীতলতার সমন্বয়ে জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করার জন্য কবি উন্মুখ হয়ে আছেন । 'অবসরের গান' কবিতায় সৌন্দর্য্যের অবক্ষয়িত রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন । জীবন হয়ে উঠেছে যন্ত্রনাময় । এই যন্ত্রনা সৌন্দর্য্যকে কলঙ্কিত করেছে । শীত সর্বস্বতা জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে । জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা, প্রেমের জন্য অকৃত্রিম তৃষ্ণার মধ্যের মৃত্যুর নীল ছায়া পড়েছে । "সমস্ত পৃথিবী ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস / দোলা দিয়ে গেল কবে ! বাসি পাতা ভূতের মতন / উড়ে আসে ! কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস -- / যক্ষার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন ! --- / জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ !" [৩] (জীবন)

মানুষের জীবনচক্রে জন্ম, মৃত্যুও প্রেমের ও প্রেমের আবর্তন ঘটতে থাকে । কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় এই আবর্তনকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন । 'পরস্পর' কবিতায় প্রেম - মৃত্যু - প্রাণের সমবায়কে ঋতুর প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেছেন । কবিতায় তিনি পরিপূর্ণতার তৃপ্তি এনেছেন, যদিও সৌন্দর্যের রূপটি তত সুন্দর ও পরিণত নয় --

"সেই জল, মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা; -- সাদা -- বরফের কুচির মতন !
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে, --
ফেনার শেমিজে

১. প্রদ্যুন্ন মিত্র ঃ জীবনানন্দের চেতনাজগৎ / দে'জ পাবলিশিং কলকাতা - ৭৩ / দ্বিতীয় সংস্করণ;বৈশাখ, ১৪০৫/ পৃ. - ১৬০
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৫৫
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৮৮

তাহাদের শরীর পিছল !”[১] -- (পরস্পর)

যেখানে সেই নারী, যে একবার তার শরীর নিয়ে কবির কাছে এসেছিল, তারপর দেখা যায় এই জটিল পৃথিবীর অজস্র মানুষের ভিড়ে দিনরাত্রির আবর্তনে হারিয়ে গেছে । আর কবি অন্তহীন পথচলায় যেন সেই নারীকেই খুঁজে চলেছেন পৃথিবীর পথে, সমুদ্রের ঢেউয়ের বিভঙ্গে, আর নীল স্তরীভূত আকাশে আকাশে, অন্ধকারে, অন্ধকার থেকে নেমে, জোনাকি ও জ্যোৎস্নার আলো ছেড়ে, নক্ষত্রের আলো চোখে মেখে চলেছেন জীবনে জীবনে । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক ইতিহাসময় অতিমর্ত্য জীবনকে স্পর্শ করার ইচ্ছা জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’ কবিতায় রয়েছে । সনেট প্রতিম রূপ ‘রূপসী বাংলা’র কবিতাগুলিতে রয়েছে । শরীরে ঘন পিনব্ধ গ্রীক ভাস্কর্য্যের সুঠাম ঐশ্বর্য রয়েছে । অত্যন্ত ধীর লয়ে বয়ে চলেছে ধলেশ্বরী--জল সিঁড়ি--ধান সিঁড়ির চিরন্তন প্রবাহ । তাঁর প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অতীত কাহিনী ধ্বনিত হয়েছে । হারানো প্রেমের বেদনা রক্তিম হয়ে উঠেছে আর এর সঙ্গে আবিষ্ট হয়েছে মৃত্যু চেতনার অতি স্পর্শকাতর নীরব অন্তঃস্রোত । গোলক ধাঁধার মতো জীবন ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ জীবনানন্দ তাঁর সাহিত্যে সযত্নে তুলে ধরেছেন । তিনি মৃত্যুকে ভালোবেসে বেঁচে ওঠার কথা, না কি জীবনকে ভালোবেসে মরণের গভীর অতলে তলিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা করেছেন -- এ প্রশ্নের অন্তহীন রেশ থেকে গেছে পাঠকের মনে । একটি গল্পে অপরূপ বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কে জীবনানন্দ লিখেছেন ---

“চারিদিককার জীবনমৃত্যুর স্রোতের ভিতর রহস্য বেদনাহত, প্রেমিক
পরমাত্মাকে ইহারা যেন নতুন করিয়া দুঃখের, বিরহের, করুণ কাতরতার,
পুলকের সঙ্গীত শুনাইতে চায় ।”[২] --- (সঙ্গ, নিঃসঙ্গ)

জীবনানন্দ বাংলাদেশের আশ্চর্য স্বপ্নমদির প্রকৃতির মধ্যে এই বিষণ্ণ উজ্জ্বল চিরন্তনীকে ধরতে পেরেছেন । জীবনের অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেন কবি ‘রূপসী বাংলা’র সনেটগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন । একসময় জীবন ধারণের জন্য কলকাতার মেসে থেকে অবসাদগ্রস্ত জীবনকে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত রাখতে হয়েছিল । বরিশালের বি. এম. কলেজে থাকার সময়ে কবি প্রিয় প্রকৃতির কোলে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। ১৯৩১ শে দিল্লীর রামযশ কলেজ থেকে বরিশালে বিয়ের কারণে চলে আসেন । তারপর আর তাঁর ফেরা হয় নি। ৩১ - ৩৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে বরিশালে থাকাকালীন অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। ‘রূপসী বাংলা’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘কারুবাসনা’, ‘নিরূপমযাত্রা’, ‘পূর্ণিমা’ এসব গ্রন্থের নির্মান ভূমি বরিশালেই । ১৯৩৩ -এ কলকাতায় আসবার কথা তাঁর বারবার মনে হয়েছে। এই যাবার তাগিদ জীবিকাগত প্রয়োজনে যতখানি ছিল, প্রাণের আহবানে ততখানি নয় । কারুবাসনা কবিকে নিরস্ত করে রেখেছে জীবিকার প্রয়োজনে । চাকুরীহীন জীবনের সাংসারিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে ‘রূপসী বাংলা’র মতো নবপর্যায়ের কবিতাগুলি লিখেছিলেন । যেখানে বরিশালের স্বপ্নময় নিসর্গ প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভালোবেসে পুরাণ কাহিনী, জন্মমৃত্যুর আবর্তন, স্বদেশপ্রেম -- এসবই এ কবিতায় বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। বরিশালের উত্তাল স্বদেশী আন্দোলনের অস্থিরতায় কবি নিসর্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে চেয়েছেন। ইতিহাস, রূপকথা, পুরাণ কথার জগৎকে এবং সেই অতীতের মৃত্যুলীন চরিত্রকে বর্তমানের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে জীবনানন্দ নিজ কাব্য ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাই রূপসী বাংলার মৃত্যুচেতনা নিসর্গ জগতের যেন এক অপরূপ রূপ। ‘রূপসী বাংলা’ পর্যায়ে প্রকৃতির উপাদানের

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ৭৩
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্প সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৫৭৮

মধ্যে এসেছে --

পাখি --

লক্ষ্মী পেঁচা, শুক, খই রঙের হাঁস, কোকিল, পায়রা, গাঙচিল, চিল, সুদর্শন, চড়াই, বউ কথা কও, নিম পাখি, গাঙ শালিক, খঞ্জনা, পেঁচা, মাছরাঙা, ফিঙে, বক, শ্যামা, হাঁস, দোয়েল, শালিখ ।

পাখি ছাড়া অন্যান্য মনুষ্যত্যর প্রাণী --

ঘোড়া, শূকরী, ঘাই মৃগ, হরিণ, পিঁপড়ে, মৌমাছি, ইঁদুর, গুগলি, শামুক, ভোমরা, ভীমরুল, জোনাকি, গুবরে পোকা, শ্যামাপোকা, প্রজাপতি, কাঁচপোকা, গঙ্গা ফড়িং, সরপুঁটি, চাঁদা, শঙ্খ ।

গাছ --

বাসক, কামরাঙা, নাটাফল, ধুন্দুল, করবী, কুল, ফণীমনসা, তাল, তেঁতুল, বঁইচি, শিমুল, বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল, হিজল, ডুমুর, জাম, তমাল, চন্দন, আম, কদম, আকন্দ, চালতা, বাঁশ, পলাশ, লিচু, সজিনা, জারুল, নোনা, করমচা, সুপুরি, বেল ।

কলমীদাম, শটিবন, পাট, শর, বেত, আনারস, নলখাগড়ার বন, ঢেঁকিশাক, চিনি শাক, সর্ষে, আশ শেওড়া, ভাঁট, হেলেঞ্চ ।

ঘাস -- মধুকূপী, পরথুপী ।

ফুল --

শেফালী, শেয়ালকাঁটা, কাঁঠালীচাঁপা, এলাচি ফুল, সজিনার ফুল, আকন্দ ফুল, দ্রোণ ফুল, বেল কুঁড়ি, ভেরেণ্ডাফুল, চাপাফুল, পদ্ম, অপরাজিতা, ভাঁটফুল, চালতাফুল ।

নদী -- ধলেশ্বরী, ধানসিঁড়ি, জলসিঁড়ি, পদ্মা, কর্ণফুলী, রূপসা, কালিদহ, গাঙুড়, জলঙ্গী ।

ঋতু -- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ।

উপরিউক্ত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি বিভিন্ন ঋতু বা ঋতু বিষয়ক মাসের উপস্থিতিতে স্বতন্ত্র রূপ নেয় । জীবনানন্দের সাহিত্যে এই প্রকৃতির স্বতন্ত্র রূপই অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে । জীবনানন্দের লেখা অসংখ্য কবিতা -- গল্প -- উপন্যাসের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে ঋতুর বিচিত্র প্রকাশের কথা । ঋতুর সাহচর্যে গড়ে ওঠা প্রকৃতির রূপে একাত্ম হয়ে মিশে যাওয়ার গভীর বাসনা প্রকাশ পেয়েছে অনেক জায়গায়। কবির বিরহী হৃদয় সৌন্দর্যময়ী নারীর সন্ধানে বার বার খুঁজে বেড়িয়েছে। রূপকথার মণিমালা, কাঁকনমালার রূপের তুল্য তার প্রিয়া । বাংলার সবুজ করুণ ডাঙার ঘাসের উপর শুয়ে কবি ভেবেছেন শঙ্খ বালিকার ধূসর রূপের কথা । কবির নষ্টালজিয়াকে তীব্রতর করে তুলেছে নক্ষত্রের ভরা রাত। ভালোবাসা নারীর সঙ্গে রূপকথার নারীর স্মৃতি জড়িয়ে গেছে । একদিকে বাংলার বুকে বাঁচার প্রত্যাশা, অন্যদিকে মৃত্যু ও ঘুমের ভেতর অন্তর্লীন হয়ে ওঠার আকাঙ্খা --- দুই আশ্চর্য ঘটনাকে তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন । কাব্যের অবয়বে জীবন, প্রেম, মৃত্যু, আকাঙ্খা ও ভালোবাসা এগুলিকে ঋতুময় প্রকৃতির সাহচর্যে ছবির পর ছবি কবি তৈরি করেছেন।

'ছায়ানট' গল্প ও 'প্রেতনীর রূপকথা' উপন্যাস জীবনানন্দের প্রথমদিকের রচনা। গদ্যসাহিত্যে জীবনানন্দের লেখনরীতির মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রণয় ও শরীরলিপ্সা। বেশ কতগুলি ছোট গল্পের মর্মকথা হল পুরুষ চরিত্রের নারীকে একান্ত করে পাবার আকাঙ্খা। 'ছায়ানট' গল্পের নায়কের অসুস্থ শরীর, ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও রেবাকে পূর্ণ করে না পাওয়ায় নায়ক অতৃপ্ত ও ক্ষুব্ধ। মাথা টিপতে টিপতে উঠে যেতে বললে রেবা স্বস্তি পায়, না ডাকলে আবার কাছে আসে না। এই নায়ক ও নায়িকা বিবাহিত নয়, তবুও

একত্রে বাস করে। জীবনানন্দ এই অপ্রাপনীয়া নারীকে 'রূপসীবাংলা'র ম্লান কিশোরী রূপে, 'বনলতা সেনের' কল্প প্রতিমা'য় এবং 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসে বিনতার প্রতিভাসে দেখেছেন। বিনতার অস্ফুট অনুরাগে ছিল শুধু প্রেমের অনুভব। বিনতার প্রতি সুকুমারের আকর্ষণ শরীরসর্বস্ব ছিল না। 'সুতীর্থ', 'মাল্যবান', 'বিভা', 'জলপাইহাটি' — এসব উপন্যাসে শরীরবৃত্তি ও মনন বৃত্তির নানারকম বিচিত্র সংযোগ ঘটিয়েছেন জীবনানন্দ। তিনি গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতাবোধ কাটিয়ে মনের সত্যরূপ প্রকাশ করেছেন। পুরুষের এই অতৃপ্ত যৌন কামনাকে প্রকটিত করতে শীতঋতুর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। 'মাল্যবান' উপন্যাসে কোনো এক শীতের রাতে স্বামীকে তার শোবার ঘরে আসতে দেখে স্ত্রী বলে, —

> "রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল
> জড়িয়ে ত কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ! ওমা, —
> ওমা! বেরোও! বেরোও বলছি।"[১]

মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, কলেজে পড়েছিলো - তাই তার সংলাপে অনেকটা স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে। দাম্পত্য জীবনে মাল্যবান শুধু অসুখী নয়, একা ও বিচ্ছিন্ন। উৎপলার সঙ্গে তার মনের মিল হয় না। ঔপনিবেশিক ভোগবাসনার দাবি দেখা যায় উৎপলার মধ্যে, সে আরাম, বিলাসিতা, দেহসুখ চায়। মাল্যবানের আত্মমুখীনতা, ভাবুকতা উৎপলার পছন্দ নয়। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে মাল্যবানের দূরত্ব তৈরি হয়। সাহস করেও অন্য নারীর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না সে। সে আক্ষেপ করে — "তার আক্ষেপ সারাটা শীতের রাতে পাওয়া যায়, এমন স্ত্রী কি সে পেতে, পারতো না।"[২] সে নিজের মায়ের সঙ্গে উৎপলার তুলনা করে। বিছানায় শুয়ে মাল্যবান নাবালকের মতোই মায়ের আদর শুশ্রূষা চায়। কিন্তু স্ত্রী তাকে কোনরূপ সহানুভূতি দেখায় না। ফলে তাদের জীবনের শীতরাত শেষ হতে চায় না। এঁটো টেবিলে মাল্যবান ঘুমিয়ে পড়লে উৎপলা তাকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করে না। জীবনানন্দ এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন 'অন্ধকার' ও 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। এ কবিতাতে দেখা যায় নায়কের বধূ, সন্তান, অর্থ - থাকা সত্ত্বেও নায়ক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কথাসাহিত্যে জীবনানন্দ মৃত্যুকে এড়িয়ে খুঁজতে চেয়েছেন অন্য কোন পরিত্রাণ। তাই 'মাল্যবান' উপন্যাসে শীতরাত ফুরুতে চায় না। 'জলপাইহাটি' ও 'সুতীর্থ' উপন্যাসের নায়কেরা গ্রাম ও প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজেছে। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নিশীথ, হারীত যে জীবনের স্বপ্ন দেখে সেখানে শহরের অস্তিত্ব নেই। গ্রামের চোত-বোশেখের সময় তাদের ভালোলাগে। হারীত বলে - "এমন একটা জায়গা খুঁজে পাইনি কলকাতায়, এমন একজন মানুষ পাইনি, যার কাছে বসে সময় নেই জেনেই সময়টাকে ভালো লাগে।"[৩] -এসব বক্তব্যে পরিষ্কার যে গ্রামের সৌন্দর্য্যের কাছে শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

জীবনানন্দ মনে প্রাণে বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতিকে চিনেছেন ও চেয়েছেন। যদিও তিনি জীবিকা ও লেখার জন্য কলকাতায় এসেছেন। আবার তাঁর বন্ধুরাও কলকাতাবাসী। কলকাতায় থেকে বরিশালের প্রতি ভালোবাসার কথা ঘুরে ফিরে সাহিত্যেও এসেছে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' ছোট গল্পে পাই —

> "শচী অনেকক্ষণ পরে বললে, 'চলো না, পাড়া গাঁয় যাই —
> 'কোন্ পাড়াগাঁয়?'
> 'যেখানে ছিলাম আমরা —'
> 'সেই বকমোহানার নদীর ধারে? ভাঁটে শ্যাওড়া ময়না কাঁটার জঙ্গলে?'
> শচী মাথা নেড়ে বললে, — 'হ্যাঁ সেখানেও"[১] —

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিতঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারাঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৭৭৮
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিতঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারাঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৮৩২
৩. তদেব, পৃ. - ৮৩৩

আবার ‘সুতীর্থ’ উপন্যাসে কলকাতা ছেড়ে জয়তী গ্রামে যেতে চাইলে সুতীর্থ স্পষ্ট বলে ‘গ্রামে গিয়ে বরাবর তুমি থাকতে পারবে না।’ অথচ সুতীর্থ জানে, বিশ্বাস করে যে, মনটাকে স্নিগ্ধ, সত্য করে নিতে হলে চাষাভুষো হয়ে থাকতে হবে গ্রামে। ‘প্রেতিনীর রূপকথা’ উপন্যাসের নায়কও কোনো এক বটগাছে, পাশে বিনতাকে নিয়ে জীবন কাটানোর প্রার্থনা করেছে বিধাতার কাছে। প্রকৃতি, জীবনানন্দের নায়কদের কাছে চেতনার একটি অংশ। তাদের অনুভূতি, আত্ম নিমগ্নতা ও বেঁচে থাকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়েছে নিসর্গ চেতনা। আসলে জীবনানন্দের প্রকৃতিমগ্নতা গল্পের নায়কের রূপকে প্রকাশ পেয়েছে। ‘পালিয়ে যেতে’ গল্পের নায়ক আসন্ন সন্ধ্যায় ঘরে বসে জানালা দিয়ে নিসর্গ দেখতে দেখতে বলতে পারে — ‘এই সমস্ত ঘরদোর যদি প্রাণীহীন হয়ে পড়ে থাকে তাহলেও দেশের বাড়ির এই মাঠ প্রান্তরের আস্বাদ, জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচার ডাকে ভরা রহস্যময় রাত, পথপ্রান্ত, মানব আত্মাকে অনেকদিন পর্যন্ত নিবিষ্ট করে রাখতে পারে’[২]।

‘নিরুপম যাত্রা’ গল্পে প্রভাত গ্রাম ছেড়ে, বাবা-মা, স্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে শহরে এসেছে অর্থের সন্ধানে। আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে প্রভাত অমর্যাদা ও গ্লানি সহ্য করেছে। চার বছর প্রভাত গ্রামে ফেরেনি। গ্রামের স্মৃতি, মায়া-মমতায় জড়ানো পারিবারিক স্মৃতি মনকে আলেড়িত করে। গ্রামের নিসর্গের ডাকে, জিনিসপত্র গোছায় সে। জীবনানন্দের অন্তর্জগতের গ্রামীন নিবিড় স্বপ্ন এবং জড় জগতের উপাদান তাঁর লেখাতে ভেসে উঠেছে। কবিতায় পাওয়া দৃশ্যগুলি আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকৃতি প্রেমিক নায়ক তথা জীবনানন্দের চেতনায়। —

“দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু’বেলা
নির্জন মাছের চোখে — পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ —”[৩] (মৃত্যুর আগে)

সমস্ত অনুভবের মধ্যেই তিনি নিসর্গ প্রকৃতির সংরাগে জীবন ও মৃত্যুর রূপাভাস ফুটিয়ে তুলেছেন —

“বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ - বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।”[৪]

নীল আকাশের তল, পথে পথে মৃদু চোখের ছায়া সুপারির সারি বেয়ে সন্ধ্যানামা, ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ ভোরের আগমন এসব গ্রামীন দৃশ্যকে, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যকে তিনি কখনই ভুলতে পারেন না। তাই জীবনানন্দের ‘নিরুপম যাত্রা’, ‘পালিয়ে যেতে’, ‘বিন্দুবাসিনী’, ‘বত্রিশ বছর পরে’, ‘কারুবাসনা’, ‘বাসমতীর উপাখ্যান’ এসব গল্প উপন্যাসে গ্রাম্য-নিসর্গের কথা বার বার এসেছে। জীবনানন্দের গ্রাম্য নিসর্গের বর্ণনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের নিসর্গ বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, বিশেষ করে ‘পথের পাঁচালী, ‘অপরাজিত’, ‘পুঁইমাচা’ এসব গল্প - উপন্যাসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেযে এবং দেশ বিভাগের পর জীবনানন্দ লিখেছেন ‘সুতীর্থ’ উপন্যাস। স্বপ্নের বাংলাদেশ ছেড়ে সুতীর্থ কলকাতা শহরে চাকরি করতে এসেছে। তবে কোন সাংসারিক জীবন জালে

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্প সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৬৪৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫৭
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১১২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১১২

নিজেকে আবদ্ধ করেনি। নারী মোহগ্রস্তহীন এক পুরুষ চরিত্র সুতীর্থ। মণিকা, জয়তী -এসব নারীরা সুতীর্থের প্রেম পেতে চায়, প্রেম দিতে চায়। কিন্তু সুতীর্থকে কেউই নিজের করে পায় না। পুরো 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি শীত পটভূমিতে লেখা। সুতীর্থ চিরকালই নিজের ইচ্ছায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চেয়েছে। জয়তী সুতীর্থকে বিয়ে করতে চাইলেও সুতীর্থ তাতে সম্মতি দেয় না। বরং সে শহর ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছে, পূর্ববঙ্গে না হয় আসামে অথবা কোন এক গাঁয়ের পথে চলে যাবে, যেখানে পাড়াগাঁয়ে শীত ঋতুর মধ্যেও আমেজ খুঁজে নিতে পারবে।

সুতীর্থ গ্রাম ভালোবাসে। তাকে কোন নারীই মোহগ্রস্ত করতে পারেনি। দেশের জন্য সে মনের খুশিতে লড়াই করে। সুতীর্থ ছাড়া এ উপন্যাসের আর দুটি পুরুষ চরিত্র - বিরূপাক্ষ ও ক্ষেমেশ। এরা কেউ নারীর প্রেম পেতে চায়, কেউ নারীর শরীর পেতে চায়। তাই এসব চরিত্রের অন্তরে ও বাইরে শীত বিরাজ করেছে। সুতীর্থের অনুভূতিতে প্রকৃতি অত্যন্ত মধুর। মণিকা যখন তার শরীর ও মনের শুদ্ধ তা নিয়ে সুতীর্থের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছে তখন বাইরের প্রকৃতি ছিল এমনই —

> "জানলার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল;মাঘ শেষ হয়ে যাচ্ছে; অনেক দূরে পাড়াগাঁর পানবন খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ-বেরঙের পাক কলমী, কাঞ্চন নতুন দুধ সোনামণি শরৎকালের ফুল উড়ে যাচ্ছে নীলের থেকে নীলের দিকে, রোদের থেকে মেঘের কণাকণিকার উজ্জ্বলতা ভেদ করে কোন দিগন্তের মাতৃগনের দিকে ফাগুনের বাতাস। ...... বেঘোর হুল্লোড়ে ফাল্গুনের বাতাস উড়ে এসে পড়ছে মণিকার চোখে চুলে, সুতীর্থের দেশলাইয়ের আগুনে, যে ট্রামটা হুম করে ছুটে গেল তার আগে কোথায় উধাও হয়ে চলে গেল — থেমে গেল বাতাস। পর মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।"[১]

মণিকার স্বামী, কন্যা সন্তান থাকার পরও সে সুতীর্থকে ভালোবাসে, সুতীর্থের প্রেম চায়। সুতীর্থকে নিজে প্রেমিক পুরুষ হিসেবে পায়নি বলে, নিজের কন্যা অমলাকে বিয়ে দিয়ে, একটু ঘুরপথে নিজের করে পেতে চেয়েছে। কিন্তু অধরা পুরুষ সুতীর্থ। কোনরকম বন্ধনের চাল দিয়ে মণিকা সুতীর্থকে নিজের করে পেতে পারেনি। অথচ মণিকাকে বিরূপাক্ষ যখন অর্থ দিয়ে, শরীর দিয়ে পেতে চেয়েছে তখন মণিকা বিরূপাক্ষের কাছ আত্মসর্ম্পণ করে নি। বরং শীতকে হাতিয়ার করে নিজের ইজ্জতকে রক্ষা করতে চেয়েছে বারবার। অপরদিকে, লেখক জীবনানন্দ সুতীর্থের নির্মল, স্বচ্ছ মনকে শীতের আবহে বর্ণনা করেছেন এরকম, — " অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট করুণার সদ্যোজাত শিশুর মত, শীতাক্রান্ত জননীর মত সেই শিশুর, বসে রইল সে।"[১] সুতীর্থের শীত, শরৎ, বসন্তের মধ্যে প্রকৃতির সমস্ত রূপ ভালো লাগলেও একটা জিনিস কিন্তু তার খুব খারাপ লাগে, — তা হল "কি অবিস্মরণীয় এদের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর প্রাণাপাত, পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদঘুটে বর্ষায় খলুইয়ের ভেতর ল্যাটা মাছের মতন। কোন সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই। সুতীর্থের মনে হল।"[২] আবার এ উপন্যাসে সুতীর্থ অনুরাগিনী মণিকা প্রকৃতির সঙ্গে নিজের ভাবনাকে মিশিয়ে দিয়েছে।—

> "মণিকা একজন নিবিড় নিশীথঠুঁটী স্বর্গীয় পাখির মত নিমেষে নিহত হয়ে ভাবছিল যে তাই যদি হত, তা হলে কি এঘরে থাকবার প্রয়োজন হত তার — কিংবা এই নগরীতে —এই পৃথিবীতে — এই গ্রহে?

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৭৫৩

মহাশূন্যের অন্ধকারের ভেতর দূর আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্য পেরিয়ে আর কোন আলো ঋতুর দেশে হয়তো চলে যেতে হত তাকে। বাইরে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস পান করবার ইচ্ছে হল তার — এই শীতের রাতেও। মাঘ ঋতুর শিশির পাখলানো নক্ষত্র তন্বী নিস্তব্ধ আকাশটাকে দেখে আসবার সাধ জেগে উঠল।"[৩]

মণিকা শরীর লোলুপ বিরূপাক্ষকে শীতরাতের কথিকা শুনিয়ে তৃপ্ত করে, শরীর লালসার হাত থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে। বিরূপাক্ষের শরীরে জাগ্রত যৌনলিপ্সাকে ঔপন্যাসিক বলেছেন "শীতটা যে ভেতরের সেটা সত্যি"[৪]। বিরূপক্ষের শীতের কাঁপুনিটা আসলে শরীরিক, নগ্ন যৌনতারই ইঙ্গিতকেই প্রকাশ করেছে। বিরূপাক্ষের সমস্ত শরীরের একটা আশ্চর্য শীত উত্তেজনায় কাঁটা দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। — এভাবেই ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ গোটা 'সুতীর্থ' উপন্যাসে মানব চরিত্র ও প্রকৃতির নানাভাবকে প্রকাশ করেছেন ঋতু উপমা দিয়ে। বিশেষ করে শীত ঋতুই এ উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনার ও চরিত্র বিশ্লেষণের মূল হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, 'বাসমতী' একটি অপরূপ জায়গা - যা বাংলাদেশে অবস্থিত। বাসমতীতে যে একবার গিয়েছে সেই উপলব্ধি করেছে বাসমতীর সুন্দর রূপ। এ উপন্যাসে রমা নামক এক নারী চরিত্রের দৈহিক সৌন্দর্যকে জীবনানন্দ বাসমতী ধানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাসমতী ধানে বা চালের চমৎকার রূপের মতোই রমার মন চেহারা। বাসমতীর নদী, বাসমতীর মাঠ, বাসমতীর বুকে বিরাজিত ঋতুগুলিও দৃশ্য রমণীয়। বাসমতীতে যারা বাস করে তারা শুধু বাসমতীকে ভালোবেসেই আছে — সেখানে অর্থ, মান কোনকিছুর করাল ছায়াপাত পড়ে না। 'বাসমতী' শব্দটি বোধহয় জীবনানন্দের খুব প্রিয়, ভালোলাগার বিষয়। তাই জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র কয়েকটি কবিতাতে 'বাসমতী' ধানের প্রসঙ্গ এনেছে অতীত স্মৃতি ও রূপসীর বাংলার দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে। —

"তাহলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহবান —
যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রের চিল আর শালিখের ভিড়
একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর,
যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরির ধান;—
কবে যে আসিবে মৃত্যু; বাসমতী চালে - ভেজা শাদা হাতখান —
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব যে স্নান"[১] —
(যদি আমি ঝরে যাই)

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৭৩৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭০৬
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৯২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৮২

অথবা

এখানে নদীর ধারে বাসমতী ধানগুলো ঝরিছে আবারো;
প্রান্তরের কুয়াশায় এইখানে বাদুড়ের যাওয়া আর আসা —”[২]

‘রূপসী বাংলা’র এসব বর্ণনার সঙ্গে ‘বাসমতীর উপাখ্যান’ উপন্যাসের প্রকৃতি বর্ণনার খুব মিল পাওয়া যায়। এ উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ তথা জীবনানন্দ বলেছেন যে, “মন বাসমতীতেই ভাল থাকবে, কাজের ভেতর বেশি ভাল থাকবে।”[৩]

জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়কদের জীবনে অর্থ সমস্যা একটি অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘প্রেতনীর রূপকথা’ উপন্যাসের নায়ক অর্থ সন্ধানে শহরে পা বাড়িয়েছে। মা, স্ত্রী মালতী এরা থেকে গেছে গ্রামে। সুকুমার ও মালতীর এদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ভিতর কোন আলোড়ন নেই, কোন রোমান্টিকতা নেই। এদের দাম্পত্য জীবনে সুকুমারের বউয়ের চেয়ে বেশি ভাল লাগত বইকে, গাঁয়ের প্রকৃতিকে। সুকুমার বলেছে —

“বইখানা প্রথম পড়েছিলাম বছর খানেক আগে - সেই তেতলার দক্ষিণ
দিকের ঘরটায় বসে, অঘ্রাণ মাস, ভারি মিষ্টি শীত ছিল তখন দেশে।
হলুদ ধান আর শীত ভাল লেগেছে বেশি না বইখানা — আজও বুঝে
উঠতে পারিনা।”[৪]

সুকুমারের জীবন নারী প্রেমশূন্য, অর্থশূন্য হয়ে আছে। জীবনানন্দ সুকুমারের এই শুষ্ক জীবনকে শ্রাবণের বৃষ্টিহীন প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুকুমারের শহরে যাওয়ার যাত্রাপথও মিষ্টি মধুর হয়ে ওঠেনি, শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে রাতের অন্ধকার এসে হাহাকার করে মিশেছে। নারীপ্রেমে ব্যর্থ সুকুমার। যে নারীকে ভালোবেসেছে সুকুমার সে নারীকে কাছের করে পায়নি কোনদিন। রেনেসাঁসের ইটালির শিল্পীরা নারী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যেমন সুন্দর দূর বিচ্ছেদের দেশের কথা ভাবত, তেমনি সুকুমার নিজের জীবনের ব্যর্থ প্রেমকে রূপকথা প্রেতনীদের কল্পকাহিনীতে জড়িয়ে নিয়েছে। সুকুমারের মনে হয়, — “বৃষ্টির ঘনঘটার ভিতর পথের সঙ্গিনী এই নদী। খোড়ো বনের ভিতর থেকে পাড়াগাঁর দুখিনী রূপমতীর উনুনের ধোঁয়া — পাশেই তার - বেল ও বাঁশের জঙ্গলের ভিতর থেকে ধূ ধূ মাঠের আনাচে-কানাচে যুগান্তের প্রেতিনীদের নিরবচ্ছিন্ন রূপকথা, কোথাও একটা চিতা, খানিকটা কাঠমল্লিকার গন্ধ - আশ শ্যাওড়ার জঙ্গলে জোনাকি; লক্ষ্মী প্যাঁচার ডাক; বাংলার মাঠঘাটের পথ দিয়ে অনেক শতাব্দী ঘুরিয়ে আনে আমাকে, প্রান্তর ও নিশুতির ফাঁক থেকে অসংখ্য মুখ উঁকি দেয়, কিশোরী ও পুরলক্ষ্মীদের নিরপরাধ নরম ডৌলের নিবিড় মুখ সব কাছে এসে বলে — ‘চিনতে পার তো?”[৫]

সুকুমারের সঙ্গে কোন নারীর প্রেমের সুমধুর সম্পর্ক তৈরি হয়নি। বিনতা তার ভালোলাগার, নারী। বিনতাকে নিয়ে গোপন প্রেম লালিত হয়েছে সুকুমারের। প্রেতিনী যেমন চিরকাল অদৃশ্য, কল্পকাহিনী হয়ে থাকে মানুষের মনে, তেমনি সুকুমারের মনেও বিনতার জন্য গোপন প্রেম জেগে রয়েছে। সেই প্রেমময়ী নারীর অপরূপ মুখ, এক বিষণ্ণ যুবতী আজকের পৃথিবীর কলরবের কোনো কথাই সে জানে না, সুকুমার বাংলার আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশের দিকে তাকিয়ে সে নারীর কল্পমুখের কথা ভাবে, স্বপ্ন দেখে। যখনই সে তার হৃদয়ে গোপন প্রেমের প্রিয়াকে ধরতে গেছে, তখনই বিবর্ণ জ্যোৎস্নার ভিতর ফড়িঙের পাখার মত মিলিয়ে

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা ঃ ঢাকা ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৫ / পৃষ্ঠা ১২৬
২. তদেব;পৃষ্ঠা - ১৩৬
৩. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৯৫৯
৪. তদেব;পৃষ্ঠা - ৩৭৬
৫. তদেব;পৃষ্ঠা - ৩৮৩

গেছে। বহুবার সুকুমার চেষ্টা করেছে বিনতাকে আপাততঃ চোখে দেখার, কিন্তু বিনতা মাঠের মধ্যে অন্ধকারে কুয়াশার মতো হারিয়ে গেছে। আজও সুকুমার জীর্ণ বাদামী তালের পাতা, ঠুঁটো তালগাছ, ফণিমনসার জঙ্গল ও বঁইচির ঝোপে, বাংলার গ্রামে, মাঠে মাঠে অন্ধকারে বিনতার মুখখানাকে খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সুকুমারও পেয়েছে বিনতার প্রেমস্পর্শভরা উপহার। কিন্তু সুকুমার যখনই বাস্তবের চোখ দিয়ে ধরতে চেয়েছে তখনই বিনতা চলে গেছে দূর থেকে অনেক দূরে। লেখক এই অধরা প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির দৃশ্যের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন — "যেখানে নীড় ছিল সেখানে শূন্য মগডালে শুকনো খড় ঝুলছে, শুধু হলুদ ঘাসের ভিতর ডিমের খোলা ছড়িয়ে রয়েছে, চারিদিকে কুয়াশা, হিম, নিস্তব্ধতা।"[১] সুকুমার মনের ভিতরে কেমন একটা নিবৃত্তি ও অবসাদ অনুভব করে। সমুদ্রের পারে অন্ধকারের ভিতর ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে তার। তার মনে হয়, তার পাশে কেউ এসে যেন কোনোদিন দাঁড়ায়নি। দুপুরবেলা একা একা নিজের ঘরে বসে দেশে ফেরার কথা ভাবে। মনে পড়ে দেশের নানা দৃশ্যের কথা। —

> "সেখানে এখন হেমন্ত, ধান ঝরছে — মাঠ হয়ে আছে হলুদ-শুকনো পাতা উলটিয়ে দোয়েলগুলো পোকা খুঁটে খায়। খয়েরের রঙের ডানা মেলে বিকালের বিষণ্ণ চিল উড়ে-উড়ে কাঁদতে থাকে। বেতের জঙ্গলের ভিতর থেকে কোরার অর্থপূর্ণ ডাক ভেসে আসে। অপরাহ্নে রোদের ভিতর বিমর্ষ মাছির দল গুঞ্জন করে ধীরে-ধীরে অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যায়। দিগন্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।"[২]

অন্ধ আক্ষেপ নিয়ে সুকুমার জীবনের অতীত দিনগুলো হাতড়ে বেড়ায়। প্রেমহীন, ক্ষমাহীন কঠিন জীবনে সুকুমার চিরকালই শুধু রূপকথার গল্পের মতো কল্পনা করে যায়, আশা করে, —"যদি কোনো ভবিষ্যৎ জন্ম থাকে, এই নক্ষত্রেই ফিরে আসতে যদি হয় আবার, ইচ্ছামতীর পারে, কোনো একটা নিশুতি বটগাছের পাশে গেরুয়া রঙের ইটের একখানা বাড়ির ভিতর বিনতাকে নিয়ে আমাকে একটা জীবন কাটিয়ে দিতে দিত্ত বিধাতা।"[৩]

দেশবিভাগের পূর্বে জলপাইহাটি ছিল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি জায়গা। লেখক জীবনানন্দ জানিয়েছেন, নিশীথ সেনের প্রিয়ভূমি বাংলাদেশ। দেশবিভাগে যখন জলপাইহাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন দেশের পরাধীনতার ক্লেশে নিশীথ জলপাইহাটি ছেড়ে চলে যায় কলকাতায়। প্রবাসী নিশীথ ছেড়ে আসা জলপাইহাটির মানুষ ও প্রকৃতির কথা ভাবে, কষ্ট পায়। শহরের মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতিকে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেখে। বন্ধু জিতেন দাশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মনে হয়, "কী বলছে আজ রাতে জিতেন দাশ? কেমন বসন্ত রাতে ধনেশ পাখির মতন দেখাচ্ছে তার চোখ।"[৪] পদ্মাপারের ওপারে জলপাইহাটি। জলপাইহাটির এক কলেজে কুড়ি-বাইশ বছর ধরে কাজ করেছে নিশীথ। নিশীথের মনকে জলপাইহাটির প্রকৃতি কতই না মুগ্ধ করে তুলতো। রৌদ্রের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল দেখেছে সে। আকাশে উড়ে যেতে দেখেছে হরিয়াল, ফিঙেকে। বড় বড় সুন্দরী বকেরা ওয়াক ওয়াক ধবনি করে আকাশে উড়ে যায়। যখন নিশীথ কলেজের ময়দান পেরিয়ে খানিকটা দূরে গেঁয়ো পথে ফেরার পথে দেখতো- ঝিল, কানসোনা, মধুকূপী, পরথুপি ঘাস, শরের বন, শনের হোগলার ক্ষেত, অপরিমেয় কাশ — যা নিশীথের খুবই ভাল লাগতো। নিশীথ বলেছে —

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৪০৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৭
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৮
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১২

"কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভাল লাগে তার। সেইসব মানুষদের ভাল লাগে - মফস্বলের গ্রামপ্রান্তর থেকে উপচে পড়ে যে সব মানুষ কার্ত্তিকের বিকেলের রোদে, চোত - বোশেখের শেষরাতের ফটিক জলের মত জ্যোৎস্নায়। এসব মানুষ সব ঋতুতে সব সময়েই ভাল।"[১]

নিশীথ মনে করে দক্ষিণা বাতাসে যতটা স্নিগ্ধতা রয়েছে, পৃথিবীর নারীর প্রেমেও তা নেই। নিশীথ চলে আসার পর নিশীথের স্ত্রী মফস্বলের বাড়িতে একেবারেই একা। ছেলে হারীত প্রায়ই বাড়িতে থাকেনা, দেশে পর্যন্ত না। নিশীথ জানে তার স্ত্রীও মরে যাবে কিছু দিনের মধ্যে হয়তো। তবুও নিশীথ ফেরে না দেশে। শহরে, বন্ধুর বাড়িতে আহারের পর "বসন্তের রাতে সাদা পরফে ঢাকা হিমানীর মত লাগল নিজের শরীরটাকে, নিজের অন্তরাত্মাকে।"[২] কখনো নিশীথের মনোজগতের সত্যি পৃথিবীর দেশ থেকে, স্বপ্নের নীড় অনীড়ের কুয়াশা থেকে নিজেকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে নিশীথ ঘুমিয়ে পড়ে।

" ঘুম বেশ গাঢ় হয়ে গেছে : জমানো বরফের আরো নীচে যে বরফ জমেছিল গত বছরের শীতে, যে-বরফের মার নেই, যার জন্য দিন নেই, রাত্রির অবসান নেই — যেমনি ভাবে।"[৩]

নিশীথের জীবন এখন ঘুম অথবা মৃত্যুর নিস্তব্ধতাকে খুঁজে নিতে চায়। নিশীথের মনের সঙ্গে প্রকৃতিও অন্যরকম হয়ে উঠেছে। চৈত্রের আলুলায়িত বাতাস যেন নারীকে নিমেষে নিহত করে দেয়। সুমাত্রা, শ্যাম, মালয়ের মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আঁশ হঠাৎ হঠাৎ নিভিয়ে ফেলে। নিশীথ বিদ্বান, তবুও বিলাসী মানুষ, দেহরসিক। রামু, ভানু, হারীত, সুমনা সব যেন নিশীথের কাছ থেকে কুয়াশার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। — সবাই যেন জলপাইহাটি, পৃথিবী অথবা নিশীথের জীবনের ইতিহাস থেকে সরে যেতে চাইছে। আসলে পৃথিবীর ইতিহাস যেভাবে মোড় নিচ্ছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের দিশাভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। শতাব্দীর শোকাবহে মানুষ আটকে পড়েছে। নিশীথ যখন দেশে ফেরে তখন হারীত বাড়ি ছাড়ে। আবার হারীত যখন ফিরে আসে তখন নিশীথ আবার কলকাতায় চলে গেছে। সুমনা মারা যায়। দেশ স্বাধীন হয়। হারীত ফিরে আসে। হারীত, তার বাবা নিশীথের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে। জলপাইহাটিতে থাকার জন্য অর্চনা অনুরোধ করে। সুমনা ও হারীতকে বোঝায় এদেশের সুন্দর প্রকৃতির কথা, মানুষের উদাহরণ দিয়ে বলে, —

"জপাইহাটিতে তুমি থাকো। এ দেশটাকে ভালোবেসে এইখানেই কাজ করো তুমি। চৈত্রের শেষ দিনগুলোর ঘর ভরা বাতাসের ভিতর বসে থেকে এ দেশটাকে দেখছতো তুমি, আমিও দেখছি কেমন চমৎকার ঘাস, আকাশ, ভাল, ফসলের দেশ। এখানে কাজ করার অনেক কিছু আছে। অনেক প্রায় মরা - আধমরা মানুষদের উপকার হয় তাতে। স্ট্রাইকের দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে আছি।"[১]

অন্যদিকে নিশীথ জিতেনের স্ত্রী নমিতার কাছে, কলকাতায় নিস্তব্ধ হয়ে দিন কাটায়। অন্ধকারে নিরবসন্ন নিঃশব্দ নিবিড়তার ভিতর থাকে।

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৪১৪
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২২

'জলপাইহাটি' উপন্যাসে চোত-বোশেখ এর প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। হারীত, সুলেখা, নিশীথ, সুমনা, অর্চনা সবাই চোত-বোশেখ সময়ের কথা তুলে ধরেছে। সুলেখার কাছে বসে থেকে হারীত চোত-বোশেখের দিনে বসন্ত ঋতুর সুদূর নীলিমার বাতাস, রোদ, পাখি, ছাদ, নিস্তব্ধতার ভেতর নিজের অধিকারের কথা বিশ্লেষণ করেছে। এসময়ের জলপাইহাটি এক অন্যরকম হয়ে উঠেছে। — "এক টুকরোও কালো মেঘ নেইতো আকাশে। গুমোট নেই। নীল আকাশ থেকে বাতাস লাফিয়ে-লাফিয়ে বেশি নীল, বেশি মধুর করে ফেলছে যেন সব।"[২] হারীতদের ঘরদোর ভরে গিয়েছে নিম, জাম, জামরুল গাছের ভিতর দিয়ে বয়ে আসা প্রশান্তিতে। সেখানে যেন শোক, দুঃখ, ভয়, রাগ কোন কিছুই ঠিক করে অনুভব করা যায় না। হারীতের মনে হয়, চোত-বোশেখের অনবচ্ছিন্ন বাতাসের ভিতর সে একটা মৌমাছির মত উড়ে চলেছে। চোত-বৈশাখ এর প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে নানা ইঙ্গিত নিয়ে নানা সময়ে উপস্থিত হয়েছে। এক সময় নিশীথ ও সুমনা হারিয়েছে তাদের কন্যা রাণুকে, দেশ বিভাগ হয়েছে, নিশীথ ঘর ছেড়েছে, হারীত ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, হারীত ফিরে এসেছে, দেশপ্রেমিক হয়েছে, সুমনা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হারীত, অর্চনা - সুমনার দিকে তাকিয়ে জলপাইহাটির প্রকৃতি অনুভব করেছে —

> "ঘুমিয়ে আছে;বাইরের পৃথিবীর দিকে অকাল;ঘরে ঘুমিয়ে আছে লোক, কথা বলছে লোক, বাইরে অবাধ প্রভৃতি — কী গভীর আহ্লাদে অপর্যাপ্ত চৈত্র-বৈশাখ। বিকেলের শেষ রোদ-বাতাসে, ছিটে মেঘের মত উড়ন্ত শিমূল তুলোয়;বড় কুলোর মত উড়ন্ত ধূসর মেঘে, বাতাসে আরো আকুল অনাকুল চৌষট্টি বাতাসে, সাদা কালো পাখির ডানাগুলোকে ছিটকে ফেলে। ভীমরুল উড়িয়ে, উঁচু উঁচু গাছের বনের ভিতর কোথাও হারিয়ে গিয়ে কোথায় চলে গেছে প্রকৃতি, সময় নেই, দেশ নেই, জলপাইহাটি নেই এমন এক স্থির নিবিড় সদর্থের ভিতরে তবুও।"[৩]

লেখক জীবনানন্দ এখানে যেন শুধু নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা দিতে বসেছেন। এদেশ পাকিস্তানের হয়েছে, মানিয়ে নিয়েছে সুলেখারা। কারণ এদেশের মায়াঘন প্রকৃতি ভালোলাগে এদের। হারীত শীত ঋতুর গভীরতা তখনই উপলব্ধি করে যখন "চারদিকে ঘিরে অন্ধকার, মাইলের পর মাইল, পৃথিবীতে মৃত্যু ঘটে প্রতিফলিত যে অমৃত্যুর দুর অপৃথিবী লোকে, সেই নিবিড় নিস্তব্ধ ও শান্তি।"[৪] তারপরই সুমনার মৃত্যুর ঘটেছে। নিশীথ এসেছে জলপাইহাটিতে। "চেনা সময়ের মৃত্যু হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে, কিন্তু তবুও রাতের বাতাসে সারাৎসার তারার আলো উজ্জ্বল,"[৫] — এভাবেই 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের পরিণতি হয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, গল্পে-কবিতায় জীবনানন্দের ঋতু চেতনার অভিনব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

---

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র / গতিধারা ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০/ পৃষ্ঠা ৪৮৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭৯
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৯২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৬০১
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৬১৬

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র, জীবনানন্দ দাশ, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৫

২. কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩, দশম সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৩

৩. বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা-৭৩,অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ, মাঘ-১৪১০

৪. সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৬, সপ্তম মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১০

৫. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৩৮৬

৬. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র, গতিধারা, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০

৭. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশের গল্প সমগ্র, গতিধারা, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০০

৮. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলিকাতা, ১৯৯৩, প্রকাশক-গোপীমোহন সিংহরায়।

৯. দেবেশ রায় সম্পাদিত, জীবনানন্দ সমগ্র (১২খণ্ড), প্রতিক্ষণ, কলিকাতা, ১৯৮৫ - ১৯৯৮

১০. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫

১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৮৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. অমলেন্দু বসু, জীবনানন্দ, বাণীশিল্প, কলিকাতা, ১৯৮৪

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য, বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ৭৩, দশম সংকলন ১৪১১

৩. অম্বুজ বসু , একটি নক্ষত্র আসে, পুস্তক বিপণি , কলকাতা ৯, চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১১

৪. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮

৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, জীবনানন্দ, দে'জ কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯

৬. অশোকানন্দ দাশ, ভূমিকা: রূপসী বাংলা, সিগনেট, ১৯৫৭

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মারক সমিতি, কলিকাতা ১৪

৮. উজ্জ্বল কুমার দাস সম্পাদিত, জীবনানন্দ স্মৃতি, আশ্বিন, ১৪০৬

৯. কথাকলি সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, কবিতা পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ২০০১

১০. করুণাসিন্ধু দাস, আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় কবি জীবনানন্দ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০০,

১১. কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪

১২. গোকুলানন্দ মিশ্র, জীবনানন্দের কবিতা জিজ্ঞাসায়; বিশ্লেষণে, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, অঘ্রাণ, ১৪১৯

১৩. গোপাল চন্দ্র রায়, জীবনানন্দ, সাহিত্যভবন, ১৯৯৭

১৪. জগন্নাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ এলিয়ট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বুক সিন্ডিকেট, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১

১৫. জহর সেন মজুমদার, জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য, মডেল পাবলিশিং, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৫

১৬. তপন গোস্বামী, জীবনের কবি জীবনানন্দ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৯৮

১৭. তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, এপ্রিল

১৮. তরুণ মুখোধ্যায়, কবি জীবনানন্দ অনুভবে অনুধ্যানে, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১০

১৯. তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, জীবনানন্দের অনেক কোরাস, কোরক পত্রিকা।

২০. তাপস বসু সম্পাদিত, জীবনানন্দ ও সমকালীন ভাবনাক্রম, পতত্রি প্রকাশন, ১৩৯৪

২১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৭৭

২২. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পদ্মাবতী (২য় খণ্ড), কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫

২৩. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ কবি ও কবিতা, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০১

২৪. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ,ভারত বুক এজেন্সি , দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৯৭

২৫. দেশ জীবনানন্দ সংখ্যা ১, ২ - নভেম্বর - ডিসেম্বর ১৯৯৮

২৬. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ পরিক্রমা, আশাবরী ১৯৯৯

২৭. নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ৬, ৪৮ তম সংস্করণ, ১৯৯৭

২৮. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা ৭৩, পূর্ণমুদ্রণ, ২০০৮-০৯

২৯. পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্পাদিত, পাঠ সংকলন, কলকাতা - ১৬ প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫

৩০. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, জীবনানন্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০

৩১. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ উপন্যাসের ভিন্নস্বর, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, ১৯৯৯

৩২. পূর্ণেন্দু পত্রী, রূপসীবাংলার দুই কবি, আনন্দ।

৩৩. প্রভাত কুমার দাস, জীবনানন্দ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৯

৩৪. প্রকাশ কুমার মাইতি, জীবনানন্দ দাশের কবিতা শৈলীবিচার ও পাঠ বিশ্লেষণ, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ - ২০১১,অক্টোবর।

৩৫. প্রকাশ কুমার মাইতি, জীবনানন্দ এবং কয়েকজন কবি, আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, ১৪০৯

৩৬. প্রদ্যুম্ন মিত্র, কবিতার গাঢ় এনামেলে, জীবনানন্দের কাব্য-ভাবনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০০

৩৭. প্রদ্যুম্ন মিত্র, জীবনানন্দের চেতনাজগৎ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০৫

৩৮. বিনয় মজুমদার, ধূসর জীবনানন্দ, কবিতীর্থ, কলিকাতা - ৯

৩৯. বিভাব - জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা - ১৯৯৮

৪০. ভূমেন্দ্র গুহ, আলেখ্য : জীবনানন্দ, আনন্দ, কলকাতা - ৯, তৃতীয় মুদ্রণ - নভেম্বর, ২০১২

৪১. ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, জীবনানন্দের দিনলিপি (বিভাব বিশেষ জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা), কলকাতা - ১৯৯৯

৪২. ভূমেন্দ্র গুহ, জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা, বিভাব পত্রিকা, ১৯৯৯

৪৩. মোহিতলাল মজুমদার, স্মরগরল, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, প্রথম করুণা প্রকাশ ২০০৭

৪৪. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ কাব্য সম্ভার, মিত্র ও ঘোষ; কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন-১৩৭৩

৪৫. যুবমানস - জীবনানন্দ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৯

৪৬. রথীন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার, বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০০

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ -১৪১৭

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতবিতান, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা ১১০০, প্রকাশ, বইমেলা ২০০১

৫৯. রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ , ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬

৬০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র), তুলি কলম, কলকাতা ৯, নতুন সংস্করণ ২০০৪

৬১. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, গীতিকা; স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি , কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

৬২. বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ, সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ-সচেতনতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ ২০০৬

৬৩. বিষ্ণুপদ গোস্বামী, ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), দত্ত চৌধুরী এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

৬৪. বীতশোক ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ, বাণীশিল্প, কলিকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

৬৫. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা কবিতা, এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮

৬৬. শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত, এই সময় ও জীবনানন্দ, সাহিত্য একাদেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

৬৭. শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর, মাধুকরী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৯

৬৮. শ্রীমতী রত্না দত্ত , ভট্টি কাব্যম (দ্বিতীয় সর্গ), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা ৬, তৃতীয় প্রকাশ ২০০৩

৬৯. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, রক্তকরবী ও অন্যান্য, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১২

৭০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্য সঞ্চয়ণ, দে বুক স্টোর, কলকাতা ৭৩, সপ্তম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮

৭১. সুকুমার রায়চৌধুরী, সুকুমার রচনা সমগ্র, সাহিত্যম; কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০০২

৭২. সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯

৭৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ -১৯৭০

৭৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ -১৯৭০

৭৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ -১৯৭০

৭৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ -১৯৭০

৭৭. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, বামা, কলকাতা ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০০৬

৭৮. সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

৭৯. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, সাধনা প্রেস, বর্ধমান - ১১, প্রথম প্রকাশ-২০০৮,১১ ফেব্রুয়ারী।

৮০. সুমিতা চক্রবর্তী, জীবনানন্দ ; সমাজ ও সমকাল, সাহিত্য লোক, কলকাতা - ৬, তৃতীয় সংস্করণ - ২০০৮

৮১. সুস্নাত জানা, জীবনানন্দ : আলোবলয়ের দিকে, ডাভ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা - ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০১১

৮২. হরেণ ভৌমিক, রবীন্দ্র সাহিত্যে ঋতুপরিক্রমা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯ প্রথম প্রকাশ - ১৪১২, ২২ শে শ্রাবণ।

৮৩. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার জীবনানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ পুর্নমুদ্রণ, ১৪১৫

৮৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, জীবনানন্দ: কবিতার শরীর, পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ-১লা জানুয়ারী, ২০০০, কলিকাতা-৯, সাহিত্য প্রকাশ।

৮৫. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008

৮৬. T. S. Eliot and his the Waste Land (A critical Study) / Student Store, Bareilly - 243001